সংগ্রামী হাতিয়ার

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র

প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ, মে-জুন, ২০২৪ ■ ৫২তম বর্ষ ■ মূল্য ৪ টাকা

কমরেড বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর জীবনাবসান

রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, সিপিআই(এম)-এর প্রাক্তন পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য গত ৮ আগস্ট '২৪, সকালবেলা তাঁর পাম এভিনিউস্থিত বাড়িতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তিনি বেশ কয়েক বছর ধরেই সিওপিডি সহ অন্যান্য রোগে অসুস্থ ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। এই দুঃসংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর রাজ্যজুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে। দলমত নির্বিশেষে বহু মানুষ তাঁর বাসভবনে গিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান। প্রধানমন্ত্রী, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, কেরালার মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা সহ নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত বহু শিল্পী, সাহিত্যিক, অভিনেতা তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক জ্ঞাপন করেন। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকেও শোক জানানো হয়। তাঁর স্ত্রী ও একমাত্র সন্তান বর্তমান।

৮ আগস্ট প্রয়াণের পর কমরেড বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মরদেহ সংরক্ষিত রাখা হয় পিস ওয়ার্ল্ডে। পরদিন ৯ আগস্ট সকালে তাঁর মরদেহ প্রথমে বিধানসভায় নিয়ে যাওয়া হলে, সেখানে শ্রদ্ধা জানান রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ ও বিধায়কবৃন্দ। এরপর মরদেহ নিয়ে আসা হয় ৩৩, আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে অবস্থিত সিপিআই(এম) রাজ্য দপ্তর মুজাফ্ফর আহমেদ ভবনে। সেখানে শ্রদ্ধা জানান পার্টির পলিটব্যুরো সদস্য প্রকাশ কারাত, বৃন্দা কারাত, তপন সেন, রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম, বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু সহ প্রয়ত কমরেড বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সহযোদ্ধারা। হাজার হাজার মানুষ শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে লাইন দিয়ে এখানে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানান। আবেগরুদ্ধ জনতার স্রোতে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট সংলগ্ন এ জে সি বোস রোড সকাল থেকে কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে যায়। মুজাফ্ফর আহমেদ ভবন থেকে তাঁর মরদেহ দীনেশ মজুমদার ভবনে (যুব সংগঠনের দপ্তর) নিয়ে আসার কথা ছিল বেলা সাড়ে তিনটায়। কিন্তু ততক্ষণে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে আসা মানুষের ভিড় এ জে সি বোস রোডের দখল নিয়েছে। সেই জনস্রোত

ঠেলে দীনেশ মজুমদার ভবনে মরদেহ পৌঁছাতে ঘড়ির কাঁটা বিকেল চারটে পেরিয়ে যায়। এখান থেকে বিশাল মিছিল সহযোগে এন আর এস মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসা বিজ্ঞানের স্বার্থে তাঁর মরদেহ দান করা হয়, জীবিত অবস্থায় করে যাওয়া তাঁর অঙ্গীকারকে মর্যাদা দিয়ে। তাঁর মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী, কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ নেতা প্রবীর মুখার্জী, ১২ই জুলাই কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক সুমিত ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা।

সংক্ষিপ্ত জীবনী ঃ

কমরেড বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের জন্ম ১৯৪৪ সালে। পিতা নেপালদেব ভট্টাচার্য, মা লীলা ভট্টাচার্য। তাঁদের পরিবার ছিল রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে আবৃত। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য ছিলেন তাঁর কাকা। তাঁর শৈশব কেটেছে উত্তর কলকাতায়। শৈলেন্দ্র সরকার ইনস্টিটিউশনের স্কুলের পাঠ শেষ করে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলায় স্নাতক হন ১৯৬৪ সালে। সমসাময়িক বাম রাজনীতিতে তিনি আকৃষ্ট হন। তারপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তখনই প্রথমে ছাত্র রাজনীতি এবং তারপরে যুব আন্দোলনে যুক্ত হন এবং নেতৃত্বে উঠে আসেন। এই রাজ্যে ডি ওয়াই এফ-এর প্রথম রাজ্য সম্পাদক ছিলেন তিনি। গত শতাব্দীর ছয়ের দশকে রাজ্যে উত্তাল গণ-সংগ্রামের দিনে ছাত্র, যুব ও গণআন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তিনি।

১৯৬৬ সালে কমরেড বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সিপিআই(এম)-এর সদস্যপদ লাভ করেন। দমদম আদর্শ বিদ্যামন্দিরে বছর দুয়েক শিক্ষকতা করার পর চাকরি ছেড়ে তিনি পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হন। সেই সময়ে বাংলায় খাদ্য আন্দোলন, ভিয়েতনামের প্রতি সংহতি আন্দোলন সহ বহু গণআন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৯৬৮ সালে তিনি গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের সম্পাদক নির্বাচিত হন। সিপিআই(এম) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন ১৯৭১ সালে। ১৯৮১-তে রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী, ১৯৮৫-তে কেন্দ্রীয় কমিটি এবং ২০০০সালে তিনি পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্য হন। স্বাস্থ্যজনিত কারণে তিনি ২০১৫ সালে পলিটব্যুরো সদস্যপদ থেকে অব্যাহতি নেন। ২০১৮ সালে তিনি পার্টির রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী থেকে অব্যাহতি নিয়ে রাজ্য কমিটিতে সাম্মানিক সদস্য হয়েছিলেন।

১৯৭৭ সালে বিধানসভা নির্বাচনে তিনি কাশীপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে সিপিআই(এম) প্রার্থী হিসাবে বিধায়ক নির্বাচিত হন। ঐ বছরেই মাত্র ৩৩ বৎসর বয়সে তিনি রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী হন। ১৯৮৭ সালে তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রিসভায় তিনি তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সাথে পৌর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরেরও দায়িত্ব পান। ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালে তিনি যাদবপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়ে চতুর্থ ও পঞ্চম বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রিসভায় যুক্ত হন। ১৯৯৬ সালে তিনি রাজ্যের স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) দপ্তরের দায়িত্বও পান। ২০০০ সালের শেষের দিকে জ্যোতি বসু স্বাস্থ্যের কারণে মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে অব্যাহতি নিয়ে পরবর্তী প্রজন্মের হাতে সরকারের নেতৃত্ব তুলে দেন। ২০০০সালের ৬ নভেম্বর মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। ২০০১ ও ২০০৬ সালে যাদবপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়ে তিনি মুখ্যমন্ত্রী হন। ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট সরকারের পরাজয় পর্যন্ত সাড়ে দশ বছর তিনি দক্ষতার সাথে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন। পরবর্তী প্রজন্মের স্বার্থে ও রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তিনি বরাবর উদ্যোগী ছিলেন। পিছিয়ে পড়া অংশের জন্য সরকারী উদ্যোগ, রাজ্যের ভিতরেই স্বাস্থ্য পরিকাঠামো গড়ে তোলা, রঙ্গনাথন কমিশনের সুপারিশ ভারতের মধ্যে সর্বপ্রথম পশ্চিমবঙ্গে কার্যকরী করে সংখ্যালঘুদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা, স্কুল শিক্ষায় মেয়েদের ঘাটতি দূর করে তাদের ব্যাপক সংখ্যায় টেনে আনা, পরিবেশ রক্ষা করে গরিবের উন্নয়নের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি পরিকাঠামো উন্নয়নে সচেষ্ট ছিলেন। সর্বোপরি তিনি আগামী প্রজন্মের জন্য বাংলাকে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। রাজ্যে শিল্পে বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে তিনি সফলভাবে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ইস্পাত শিল্প, রাসায়নিক শিল্প, তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প এবং অটোমোবাইল শিল্প গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। সিঙ্গুরে অটোমোবাইল শিল্পে ৮০ শতাংশ কারখানা তৈরি হয়েও বিরোধীদের হিংসাত্মক আন্দোলনে তা ধ্বংস হয়ে যায়। রাজ্যের বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের উদ্যোগে জল ঢেলে দিয়েছিল বিরোধীরা।

মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তিনি রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ত্রয়োদশ (২০০১), চতুর্দশ (২০০৪), পঞ্চদশ (২০০৯) ও ষোড়শ (২০১০) সম্মেলনে তিনি উপস্থিত হয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করেছিলেন। রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের অভাব-অভিযোগ, দাবি-দাওয়া নিয়ে একাধিকবার মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সাথে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বের সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। তিনি কর্মচারীদের দাবিগুলি গুরুত্ব দিয়ে শুনতেন এবং বিহীত করার চেষ্টা করতেন। বর্তমান সময়ে রাজ্য কর্মচারীরা যা ভাবতে পারেন না।

তাঁর অনাড়ম্বর জীবন, সংস্কৃতি মনস্কতার জন্য রাজনৈতিক ভাবে ভিন্নমতের মানুষও তাঁকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন। কমরেড বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বাংলায় আগামী প্রজন্মের একজন স্বপ্নদ্রষ্টার জীবনের সমাপ্তি ঘটল। □

সম্পাদকীয়

জাস্টিস ফর আর জি কর

কলকাতা শহরকে বলা হয় কল্লোলিনী তিলোত্তমা। আজ সেই শহর আরেক তিলোত্তমার বিচার চেয়ে সত্যিকারের কল্লোলিনীরূপ গ্রহণ করেছে। শুধু কলকাতা নয়, গোটা রাজ্য এমনকি গোটা দেশকে নাড়িয়ে দিয়েছে ৯ আগস্ট সকালে আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ৩১ বছর বয়সী এক পি জি ট্রেনী ডাক্তারকে নৃশংস ভাবে অত্যাচার ও ধর্ষণ করে খুনের ঘটনা। ক্ষোভ এবং প্রতিবাদ ছড়িয়েছে বিদেশেও। সেই নিহত তরুণী ডাক্তারের নাম দেওয়া হয়েছে 'তিলোত্তমা'। এই হত্যার ভয়াবহতা, এর সাথে বিরাট বড় দুর্নীতি যোগ থাকার অভিযোগ, সর্বোপরি প্রশাসন এবং পুলিশের পক্ষ থেকে তথ্য আড়াল করা ও নষ্ট করার নানা অভিযোগ সাধারণ মানুষের ক্ষোভে ঘৃতাহুতি দিয়েছে। ঘটনার পর থেকে এই ঘৃণ্য অপরাধের বিচার চেয়ে এবং নিজেদের নিরাপত্তার দাবিতে জুনিয়ার ডাক্তাররা সারা রাজ্যজুড়ে ঐক্যবদ্ধভাবে কর্মবিরতিতে নেমে পড়ে। সেই কর্মবিরতি লাগাতার ৪২ দিন ধরে চলেছে। জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সামিল হয়েছে নানা অংশের মানুষ। ১৪ আগস্ট নারীদের রাত দখলের কর্মসূচীতে জনগণের এত ব্যাপক অংশের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ সুদূর অতীতে পরিলক্ষিত হয়নি। সরকারের পক্ষ থেকে নানা ধরনের চাপ সৃষ্টির প্রয়াসকে উপেক্ষা করে জুনিয়র ডাক্তারদের এই প্রতিবাদ-আন্দোলন চলছে। ২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার পর যেকোনো ধরনের ন্যায্য আন্দোলনের সামনে যে সরকার মাথা নোয়ানো দূরের কথা, সামান্য আলোচনার পরোয়া করেনি, সেই ধরনের সরকারকে কার্যত আন্দোলনের সামনে নতজানু হতে বাধ্য করেছে জুনিয়ার ডাক্তারদের ঐক্যবদ্ধ নাছোড় আন্দোলন এবং তার পাশে এসে দাঁড়ানো স্বতঃস্ফূর্ত জনতার ঢল। শাসক যতই উদ্ধত, স্বৈরাচারী হোক, মেরুদণ্ড সোজা রেখে, ঐক্যবদ্ধভাবে, জনগণের বৃহত্তর অংশকে পাশে নিয়ে যদি নির্ভীকভাবে লড়াই করা যায়, তাহলে তাকেও হার মানতে হয়। লড়াই সবে শুরু হয়েছে, বিষয়টি সুপ্রীম কোর্টের তত্ত্বাবধানে সিবিআই-এর তদনান্তীন আছে। এখনও অনেক দূর যেতে হবে। তাই সংগ্রাম জারি থাকছে। এই সংগ্রামে রাজ্যের মধ্যবিত্ত কর্মচারী সমাজ শুরু থেকেই ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে।

যে কোনো রাষ্ট্রে নারীদের সুরক্ষার বিষয়টি নানা ধরনের উপাদানের উপর নির্ভরশীল। সেই দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থা যেমন আছে, তেমনি শাসনক্ষমতায় যারা আসীন আছে তাদের এই বিষয়ে রাজনৈতিক সদিচ্ছা ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ। লিঙ্গসমতার প্রসঙ্গটি বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচিত হতে পারে না। এককথায় বলতে গেলে যে সমাজে দুর্নীতি, স্বৈরাচার, মৌলবাদ এবং অগণতান্ত্রিক নানা কার্যকলাপ প্রাধান্য এবং কখনও কখনও প্রশ্রয় পায় সেই সমাজ লিঙ্গসমতা বা নারী সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারে না। আইনী সুরক্ষা কাগজে কলমেই থেকে যাবে রাষ্ট্রের যারা চালিকা শক্তি তাদের যদি রাজনৈতিক সদিচ্ছা না সুরক্ষা থাকে। দুঃখের হলেও সত্যি যে আমাদের রাজ্য এবং দেশের শাসকগণ একই দোষে দুষ্ট।

২০১৩ সালে আমাদের দেশে কর্মক্ষেত্রে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারীদের উপর যৌন হয়রানিরর মোকাবিলায় বিশাখা গাইডলাইন অনুযায়ী আইন পাশ হলেও কী কেন্দ্র, কী রাজ্য সরকার এই সংক্রান্ত কোনো ব্যবস্থা গ্রহণে যত্নবান হয়নি। এই গাইড লাইন অনুযায়ী প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, কর্মক্ষেত্রে থাকা উচিত আই সি সি (ইন্টারনাল কমপ্লেইন্ট কমিটি)। তা কার্যকর হয়নি। অথচ এই বিশাখা গাইড লাইন প্রস্তুত হওয়ার পিছনেও এক নারীর উপর অত্যাচারের করুণ কাহিনীর প্রেক্ষাপট রয়েছে। ১৯৯২ সালে ভানওয়ারি দেবি, রাজস্থানের ভাটেরি অঞ্চলের সমাজসেবি, তিনি রাজস্থান সরকারের নারী উন্নয়ন প্রকল্পে কাজ করতে গিয়ে গণধর্ষণের শিকার হন। ঐ এলাকার প্রভাবশালী উচ্চবর্গের হিন্দু রামসরণ গুজ্জরের নাবালিকা কন্যার বিয়ে আটকানোর 'অপরাধে' রামসরন ও তার পাঁচ বন্ধুর দ্বারা ঐ মহিলা গণধর্ষিত হন। অভিযুক্তরা ছাড়া পেয়ে যান প্রথমত রামসরন গুজ্জর প্রভাবশালী বলে গ্রামের লোকেরা তার বিরুদ্ধে মুখ খোলেনি। আর দ্বিতীয়ত ধরে নেওয়া হয় রামসরন গুজ্জর-রা উচ্চবর্ণের হিন্দু, তাই তারা ভানওয়ারি দেবির মতো নিম্নবর্ণের মানুষকে স্পর্শ করে না। মূলত ব্রাহ্মণ্যবাদী, পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার প্রতিফলন এটি। যাই হোক এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তীতে বিভিন্ন মহিলা গোষ্ঠী, এনজিও একত্রিত হয়ে একটি প্ল্যাটফর্ম গঠন করে, তার নাম দেওয়া হয় বিশাখা প্ল্যাটফর্ম। ১৯৯৭ সালে বিশাখা গাইডলাইন প্রকাশিত হয় এবং ২০১৩ সালে তা বিশাখা আইন হিসাবে স্বীকৃতি পায়। সংবিধানের ১৪, ১৫ এবং ২১ নম্বর ধারাকে মাথায় রেখে কর্মক্ষেত্রে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা ও শোষণ রুখতে এই গাইডলাইন। এই গাইডলাইন অনুযায়ী প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে আই সি সি এবং জি এস ক্যাশ (জেন্ডার সেন্টিটাইজেশন কমিটি এগেইনস্ট সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট) কার্যকর করার কথা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই কমিটিতে আইনজীবী, এন জি ও কর্মী, নির্বাচিত ছাত্র প্রতিনিধি থাকার কথা। সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা কর্মক্ষেত্রের প্রধান এই কমিটিতে থাকতে পারেন না। আর জি কর মেডিকেল কলেজে গাইডলাইন না মেনে প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ এই কমিটিতে ছিলেন। ফলত কমিটির কোনো বৈধতা ছিল না। বর্তমানে সিবিআই হেফাজতে থাকা এই সন্দীপ ঘোষ বর্তমানে হাসপাতালে দুর্নীতি এবং তিলোত্তমার ধর্ষণ-খুনের অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত। বিশাখা গাইডলাইন মানা হয়নি রাজ্যের ২৬টি মেডিকেল কলেজের অধিকাংশতেই। এর দায় অবশ্যই রাজ্য সরকারের বর্তায়। রাজ্য সরকার দুর্নীতি আড়াল করার ক্ষেত্রে যে অতি সক্রিয়তা দেখাচ্ছে, তার সামান্য অংশও যদি এইক্ষেত্রে দেখাতেন তাহলে আমাদের তিলোত্তমার এই করুণ পরিণতি হয়তো দেখতে হত না। সুতরাং সংবিধান, আইন এই সবকিছুই তখন মর্যাদা পায় যখন শাসক সেগুলি প্রয়োগের বিষয়ে সদিচ্ছা, আরও পরিষ্কারভাবে বললে রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রকাশ করে। রাজ্য বিধানসভায় ধর্ষণ বিরোধী 'অপরাজিতা' বিল পাশ করালেই সেই সদিচ্ছা প্রমাণিত হয় না। আমাদের দাবি রাজ্য সরকার সমস্ত কর্মক্ষেত্রে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশাখা আইনকে কঠোরভাবে কার্যকরী করে নারীদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করুক।

রাজ্যে তিলোত্তমার বিচার চেয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সব অংশের মানুষ রাজপথে নেমে এই আন্দোলনকে গণআন্দোলনে পরিণত করেছেন। প্রথমে মহানগরের রাজপথ, পরবর্তীতে গ্রামাঞ্চলের আলপথ উজিয়ে মিছিল করেছে সাধারণ মানুষ। 'তোমার স্বর, আমার স্বর, জাস্টিস ফর আর জি কর' এই শ্লোগান কার্যত গণ হিস্টিরিয়ায় পরিণত হয়েছে। এই আন্দোলনে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ততার ব্যাপক প্রতিফলন ঘটেছে এটা অবশ্যই স্বীকার্য। কোনো রাজনৈতিক দলই এটা অস্বীকার করছে না। দলীয় রাজনীতি অবশ্যই এই আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রণ করছে না। কিন্তু দলীয় রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ না করলেই কোনো আন্দোলন রাজনীতিবর্জিত হবে এই গ্যারান্টি কেউ দিতে পারে কি? রাজনীতি সম্পর্কে উদাসীন অথবা প্রকাশ্যে রাজনীতি করেন না অথবা সরাসরি রাজনীতি করেন না, কিন্তু রাজনীতি সচেতন এমন বহু মানুষ যেমন এই আন্দোলনে আছেন, তেমনি সরাসরি রাজনীতি করেন এমন বহু মানুষ শুধু আন্দোলনে সামিল হচ্ছেন না, অন্যান্য মানুষদের সামিল করতে উদ্যোগী হচ্ছেন। তাই দলীয় রাজনীতির ঝাণ্ডা হয়তো আন্দোলনে নেই, কিন্তু আন্দোলনটার চরিত্র একদম রাজনৈতিক তা বলা যাবে না।। 'জাস্টিস ফর আর জি কর' স্লোগানটা কি নিছক কয়েকটি শব্দ? তা তো নয়। এই স্লোগানের আগে কিছু বক্তব্য আছে, পরেও কিছু বক্তব্য আছে। কার কাছে জাস্টিস চাইছি, সে যদি জাস্টিস না দিতে পারে, তারপর কী করা হবে? এই প্রশ্নগুলির উত্তরের অভিমুখটাই তো রাজনৈতিক। এটাকে গুলিয়ে দিলে তো মূল বিষয়টাই হারিয়ে যাবে। মিডিয়ার একটা অংশ সেই চেষ্টাই করছে। কোনো রাজনৈতিক দল দাবি করছে না যে এই গণআন্দোলনের পিছনে সেই রাজনৈতিক দল আছে। তাহলে মিডিয়ার একাংশের 'রাজনীতি নেই, অরাজনৈতিক আন্দোলন' বলে বার বার চিৎকার করার উদ্দেশ্য কী? আসলে এটা হল অরাজনীতির মুখোশে রাজনীতির একটা কৌশল। শুধু স্বতঃস্ফূর্ততা কোনো আন্দোলনকে সাময়িক কিছু সুবিধা বা সাফল্য দিতে পারে। কিন্তু তার সুদূর প্রসারী লক্ষ্যে পৌঁছোতে পারে না। উদাহরণ হিসাবে 'অকুপাই ওয়ালস্ট্রীট' সহ আরও কিছু আন্দোলনের পরিণতির কথা বলা যেতে পারে। কাজেই অরাজনীতির কারবারিরা যে কোনো আন্দোলনকেই স্বতঃস্ফূর্তার গণ্ডীর মধ্যে আটকে রেখে সেই আন্দোলনের বৃহত্তর লক্ষ্যকে আড়াল করতে চায়। কারণ তারা জানে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা। এ বিষয়ে জনগণের সব অংশকে সজাগ থাকতে হবে। □

১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪

শোক সংবাদ

কমরেড কিশোরী মোহন দাস

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতি (W.B.M.O.A) কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর প্রাক্তন ও দপ্তর সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও কলকাতা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড কিশোরী মোহন দাস গত ১৬-০৬-২০২৪, ৬৯ বৎসর বয়সে 'লে-লাদাখে' শ্বাসজনিত সমস্যায় প্রয়াত হন। তাঁর মরদেহ সমিতির (W.B.M.O.A) কেন্দ্রীয় দপ্তরে নিয়ে আসার পর মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি এবং সমিতির বর্তমান ও প্রাক্তন নেতৃবৃন্দ।

তিনি ১৯৮২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সুপারেনট্রেডিং ইঞ্জিনিয়ার বিধাননগর, পি. ডব্লিউ. ডি-তে গ্রেড-১ টাইপিস্ট হিসাবে চাকুরিতে প্রবেশ করেন। চাকরীর শুরু থেকেই তিনি সংগঠনের সাথে যুক্ত হন। কর্মচারী আন্দোলন তথা শ্রমজীবী মানুষের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আসা কর্মচারী, কর্মী সংগঠক ও সমস্যাগ্রস্থ মানুষদের সাথে আন্তরিকতা ও সহমর্মিতার মাধ্যমে তাদের আপনজন হয়ে উঠতেন। আপন কর্মস্থল শুধু লবণহ্রদেই নয়, তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতা, সদা হাস্যময় মধুর ব্যবহারের মাধ্যমে গোটা রাজ্যের কর্মী সংগঠকদের কাছের মানুষ হয়ে উঠেছিলেন।

প্রবীণ মানুষদের নিয়ে সংগঠন করা, বয়সজনিত অসুবিধা অতিক্রম করে তাঁদের লড়াই আন্দোলনের অংশীদার করার ক্ষেত্রে তিনি সফলতা দেখিয়েছেন। মতাদর্শের প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য থেকে তিনি শারীরিক নানা প্রতিবন্ধকতা জয় করে সমস্ত কর্মসূচীতে অংশ নিতেন। তাঁর অসম্ভব ভ্রমণের নেশা ছিল। বিশেষ করে পাহাড়। যৌবনকাল থেকেই ট্রেকিং ও বিভিন্ন খেলাধুলার সাথে যুক্ত থাকতে ভালোবাসতেন। পরিবার সহ তাঁর আপনজনের শত নিষেধ সত্ত্বেও মনের জোরে ৬৯ বৎসর বয়সেই আবার 'লে-লাদাখ' ভ্রমণে বেড়িয়ে পড়েছিলেন। 'লে'-র উচ্চতাজনিত কারণে শ্বাসকষ্টের অসুস্থতায় প্রয়াত হন। পাহাড় প্রেমিক মানুষ পাহাড়ের উচ্চতায় চিরনিদ্রায় চলে গেলেন। মৃত্যুকালে তাঁর স্ত্রী, কন্যা এবং জামাতা বর্তমান। □

কমরেড চিন্ময় দত্ত

গত ২ আগস্ট '২৪ প্রয়াত হলেন কোচবিহার জেলার সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের অন্যতম নেতৃত্ব চিন্ময় দত্ত। তিনি সকলের কাছে ভোলাদত্ত নামে বেশি পরিচিত ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। গত ১/৮/২৪ ইং তারিখে (বৃহস্পতি বার) শারীরিক অসুস্থতা বোধ করায় স্থানীয় 'এম জে এন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং ২.৮.২৪ শুক্রবার ভোর রাত্রে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

জন্ম কোচবিহার জেলা শহরে। পিতা প্রয়াত বিনোদ বিহারী দত্ত ছিলেন কোচবিহার জেলার প্রতিষ্ঠিত উকিল। মারা প্রয়াত সরজুবালা দত্ত। স্ত্রী গত ২০১৩ সালে প্রয়াত হন।

তিনি জেলা .... স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে ভিক্টোরিয়া কলেজ অধুনার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু তিনি তখন বিশেষ করে ছাত্রাবস্থা থেকেই বামপন্থী মতাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হন যুব আন্দোলনেও তাঁর ভূমিকা ছিল উজ্জ্বল। ফলস্বরূপ শিক্ষা (কলেজ) সম্পন্ন করতে পারেননি।

১৯৫৬ সালে কোচবিহার কালেক্টর দপ্তরে চাকুরিতে প্রবেশ করেন। বিভিন্ন দপ্তরে তিনি সুনামের সঙ্গে কাজ করেন। বিশেষ করে উদ্বাস্তু ত্রাণ এবং পুনর্বাসন দপ্তরে। দীর্ঘদিন তিনি ওই দপ্তরে ছিলেন।

১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি জেলার আহ্বায়ক ছিলেন। ১৯৭০ সালে জেলা সম্মেলনের মধ্য দিয়ে তিনি জেলার প্রথম সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত তিনি সুনামের সাথে সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে তিনি জেলার সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৫৬-১৯৭৬ সাল পর্যন্ত কোচবিহার জেলার ১২ই জুলাই কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক ছিলেন। ১৯৯০ সালে তিনি চাকুরী থেকে অবসর নেতা। মৃত্যুর শেষদিন পর্যন্ত তিনি জেলার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতির উপদেষ্টামণ্ডলীর অন্যতম সদস্য ছিলেন।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত সহজ সরল মনের অধিকারী। সদাহাস্য মানুষ ছিলেন। তাঁর অতি সাধারণ জীবনধারা বিশেষভাবে উদাহরণযোগ্য। সাধারণ গরিব, মেহনতী মানুষের সুখ-দুঃখের আমৃত্যু সাথী ছিলেন তিনি। তার অমায়িক ব্যবহার ভীষণভাবে আকৃস্ট করত সাধারণ মানুষকে। এলাকায় দলমত নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের মধ্যে একজন উদাহরণ বামপন্থী মানুষ হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। কন্যা, জামাই ও দুই নাতি বর্তমান। □

ধাক্কা খেল স্বৈরাচারের অশ্বমেধের ঘোড়া

অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনে কেন্দ্রের শাসকদলের অশ্বমেধের ঘোড়াকে জোড় ধাক্কা দিল দেশের জনগন। ভারতের জনগণ সংবিধান রক্ষা, আমাদের প্রজাতন্ত্রের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক চরিত্র বজায় রাখা এবং ক্রমশ নিম্নগামী জীবন জীবিকার পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেই এইবারের নির্বাচনে ভোটদান করেছে শুধু নয় ঐতিহাসিক ভাবে হস্তক্ষেপ করেছে দেশের রাজনীতিতে। তারা নিশ্চিত করেছে কেন্দ্রের শাসকদল যেন একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পায়, যা তারা গত দুটি লোকসভা নির্বাচনে পেয়েছিল। মন্দির-মসজিদ-মেরুকরণ নয়য় জিতেছে প্রকৃত ইসুর আমজনতার রুটি-রুজির লড়াই। গণতন্ত্র ও সংবিধান রক্ষার শপথ। দেশের ১০ বছরের প্রধানমন্ত্রীকে ঘিরে তৈরি করা হয়েছিল যে "অপারেজয়" ভাবমূর্তি, এই নির্বাচনের ফলাফল তাতে এক বিরাট আঘাত। দাপুটে কর্পোরেট মিডিয়ার পরাজয়। দালাল স্ট্রিট নয়, নির্ণায়ক আমজনতার রাস্তা। জনাদেশে স্পষ্ট, কেউ অতিমানব নয়। গণতন্ত্রে গণদেবতাই নায়ক। এই রায় আসলেই গণতন্ত্র ও সংবিধান রক্ষায় দেশের জনগণের এক নির্ভীক দৃপ্ত ঘোষণা।

কেন্দ্রের শাসকদলের ৪০০-এর বেশি আসন জয়ের আস্ফালনকে প্রত্যাখ্যান করে, ভারতের নির্বাচকমন্ডলী তাদের লোকসভার এককসংখ্যা গড়িষ্ঠতার তলায় ২৪০ এ নামিয়ে দিয়েছে, যা ২০১৯-এর লোকসভার চেয়ে ৬৩ কম। সামগ্রিকভাবে কেন্দ্রের শাসকদল আগের ১২টি আসন হারিয়েছে, তবে ২৯টি নতুন আসন জিতে তাদের মোট ক্ষতি হয়েছে ৬৩টি আসনের সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য জরুরী আসনসংখ্যার চাইতে তাদের ৩২টি আসন কম রয়েছে। অবশ্য এন ডি এ-র অন্যান্য দলগুলি অতিরিক্ত ৫২টি আসনে জয়ী হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এনডিএ জোটের হাতে রয়েছে মোট ২৯২টি আসন, যা প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার চাইতে মাত্র ২০টি বেশি ইন্ডিয়া ব্লকের দলগুলি জনগণকে জোটবদ্ধ করে ২৩৪টি আসনে জয়লাভ করেছে যা সংখ্যাগরিষ্ঠতা থেকে ৩৮টি কম। এনডিএ জোট সবকটি নির্বাচনী ক্ষেত্র মিলিয়ে মোট প্রদত্ত ভোটের ৪২.৫ শতাংশ ভোট পেয়েছে। ইন্ডিয়া ব্লক দলসমূহের পক্ষে রয়েছে ৪০.৬ শতাংশ ভোট। অর্থাৎ শাসক আর বিরোধী পক্ষের মধ্যে ভোটের পার্থক্য ২ শতাংশের চাইতেও কম-১.৯ শতাংশ। এই প্রতিকূল ফলাফল সত্ত্বেও এবং এনডিএ জোট সরকার গঠনে বাধ্য হওয়ার পরেও, কেন্দ্রের শাসকদল তাদের আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য নিরলস আক্রমণ শুরু করেছে। বিজেপির সামগ্রিক ভোট সামান্য ১ শতাংশের কিছু বেশি মত হ্রাস পেয়েছে এই বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে।

এবারের নির্বাচনে নিরপেক্ষতার প্রশ্নে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা বঠক্ষেত্রেই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে। বড় রকমের নির্বাচনী বিধিভঙ্গ হলেও, তা রোখার নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ছিল একপেশে। কেন্দ্রের শাসকদলের তাবড় তাবড় নেতারা মুসলিম-বিদ্বেষী ঘৃণা-ভাষণে ছিলেন বেপরোয়া। এক্ষেত্রে নেওয়া হয়নি কোনও নিরপেক্ষ পদক্ষেপ। নির্বাচনের তথ্য- পরিসংখ্যান নিয়েও কমিশন বজায় রাখতে পারেনি তার স্বচ্ছতা। সর্বত্র তৈরি হয়েছে সন্দেহ, অবিশ্বাসের পরিবেশ। যা, রাষ্ট্রের এই গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানটির বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েই উঠে এসেছে একের পর এক প্রশ্ন। একই সঙ্গেই বিরোধীদের ওপর চলেছে সংগঠিত রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক আক্রমণ। গ্রেপ্তার করা হয়েছে বিরোধী দু'জন মুখ্যমন্ত্রীকে। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে দুই বিরোধীদল-এর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে দিয়ে হয়রানি করা হয়েছে বিরোধী দলগুলির নেতাদের। হাজার হাজার কোটি টাকার নির্বাচনী বন্ডের ভাণ্ডার নিয়ে নির্বাচন লড়েছে কেন্দ্রীয় শাসকদল। এতদসত্বেও এই কতৃর্ত্ববাদী-স্বৈরতান্ত্রিক আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন দেশের মানুষ। যোগ্য জবাব দিয়েছেন সমস্ত ধরণের আক্রমণের। কাজ করেনি রাম মন্দিরের আবেগ। অযোধ্যার রামমন্দির যে লোকসভা কেন্দ্রের আওতায়, সেই ফৈজাবাদেই হেরেছে এরা, জিতেছেন একটি আঞ্চলিক দলের দলিত প্রার্থী। অ-সংরক্ষিত আসনে দলিত প্রার্থী দেওয়া, উত্তরপ্রদেশ, বিহারের মতো রাজ্যে রীতিমতো "রাডিকাল" ঘটনা। 'পাসি' সম্প্রদায়ের সেই দলিত প্রার্থী শুধু

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে

বর্ধিত রাজ্য কাউন্সিল সভার আহ্বান

সকল কর্মচারীর সাথে নিবিড় যোগাযোগের মাধ্যমে সংগঠনের শক্তিকে দৃঢ় ও সুসংহত করতে হবে

বিংশতিতম রাজ্য কাউন্সিলের দু'দিন ব্যাপী পঞ্চম সভা (বর্ধিত) বিগত ১৩ জুলাই '২৪ ও ১৪ জুলাই '২৪ কলকাতার কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট সভাগৃহে

বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী

অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ইতিহাসে এই ধরনের বর্ধিত রাজ্য কাউন্সিল সভা এই প্রথম সংগঠিত হল। রাজ্য কাউন্সিল প্রতিনিধি ছাড়াও প্রতিটি মহকুমা কমিটির সম্পাদকদের এই বর্ধিত সভায় যুক্ত করা হয়েছিল।

এই কাউন্সিল সভা পরিচালনা করেন মানস দাস, নিবেদিতা দাশগুপ্ত এবং রবীন্দ্রনাথ সিংহ রায়কে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। সভায় প্রারম্ভিক প্রস্তাব উত্থাপন করেন সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী। বর্তমান পরিস্থিতির সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন করতে গিয়ে তিনি বলেন যে, অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল দক্ষিণপন্থী শক্তির অগ্রগতি কিছুটা হলেও প্রশমিত করেছে। বিজেপি একক গরিষ্ঠতা পায়নি, যেটা বিগত দুটি নির্বাচনে তারা পেয়েছিল। মোদি সরকার এই নির্বাচনের পর এন ডি এ সরকারে পরিণত হয়েছে। দেশের সংবিধানে, গণতন্ত্রকে রক্ষার স্বার্থে গঠিত INDIA মঞ্চ বিরোধী নেতৃত্বাধীন এন ডি এ সরকারকে চ্যালেঞ্জ করার মতো শক্তি অর্জন করেছে। এই রাজ্যে বিজেপির আসন কমেছে। বামগণতান্ত্রিক শক্তির ফলাফল আশানুরূপ হয়নি। এই রাজ্যে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের আসন বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলত এই রাজ্যে রাজনৈতিক ভারসাম্য, শ্রমিক-কর্মচারী আন্দোলনের পক্ষে নেতিবাচক স্থানেই আছে। এমতাবস্থায় দ্বিধাদ্বন্দ্ব, দোদুল্যমান কর্মচারীদের সাথে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপন ছাড়া বিকল্প কিছু নেই। সমস্ত অংশের কর্মচারী ও তাদের পরিবার-পরিজনদের সাথে নিবিড় যোগাযোগের মধ্য দিয়ে সাংগঠনিক শক্তিকে সুসংহত করতে হবে। দৃঢ় ও সংঘবদ্ধ সাংগঠনিক শক্তি অর্জন করে

দেবব্রত রায়

আগামী দিনে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারের স্বৈরাচারী নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামতে হবে।

সাধারণ সম্পাদক বিগত কর্মসূচীর পর্যালোচনা করেন। ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ১০ মার্চ '২৪ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির আহ্বানে পাহাড় থেকে সাগর 'অধিকার যাত্রা'-র অভূতপূর্ব সাফল্যের প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। এই পদযাত্রার মধ্য দিয়ে ৩৬০০ কিলোমিটারের পদযাত্রায় ২২টি জেলার ১৫০টি ব্লক, ৪৬টি পৌরসভা ও পৌরনিগম, ২৯টি মহকুমায় মোট ১৫৭টি পথসভার মাধ্যমে জনগণের সাথে কর্মচারী আন্দোলনের মেলবন্ধন ঘটানো সম্ভব হয়। এই সংগ্রামের বহমান ধারকের অব্যহত রেখেই যৌথমঞ্চের আহ্বানে ১৪ মার্চ '২৪ সংগঠিত হয় নবান্ন অভিযান। এই প্রথম প্রশাসনের রক্ষচক্ষু উপেক্ষা করে নবান্নের দোড়গোড়ায় পৌঁছায় রাজ্য কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীদের এক সুবিশাল মিছিল।

অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে রাজনৈতিক সংগ্রামের প্রেক্ষাপট তৈরি হয়, সেক্ষেত্রেও সংগঠন কর্মচারী, অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী ও তাদের পরিবারের কাছে পৌঁছানোর উদ্যোগ সহ পথসভা, মিছিল ইত্যাদি কর্মসূচী গ্রহণ করে।

বর্তমান কঠিন সময়কে মোকাবিলার জন্য আশু কিছু কর্মসূচীর প্রস্তাব তিনি করেন।

সাধারণ সম্পাদকের উত্থাপিত প্রারম্ভিক প্রস্তাবনার উপর ২১টি জেলা, ৬টি অঞ্চল, ২৭টি মহকুমা, ৫টি অন্তর্ভুক্ত সমিতি, ৩টি সহযোগী সমিতির পক্ষ থেকে মোট ৬২ জন আলোচনা করেন। সমগ্র আলোচনা গুটিয়ে জবাবী বক্তব্য রাখেন যুগ্ম সম্পাদক দেবব্রত রায়।

পঞ্চম কাউন্সিল সভা থেকে গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ ঃ

আগামী কর্মসূচী ঃ

(ক) স্বাধীনতার ৭৮তম দিবসের দিন যথাযথ মর্যাদা দিয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে হবে। ভারতের সংবিধানের অন্তর্বস্তুর গুরুত্ব ব্যাখ্যা এবং পরিবার পরিজনকে যুক্ত করে সাংস্কৃতিক কর্মসূচী করতে হবে।

(খ) আগামী ১৩-১৪ আগস্ট, ২০২৪ সর্বভারতীয় ফেডারেশনের জাতীয় কার্যনির্বাহী সভা হবে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

(গ) আগামী ২৬-৩০ আগস্ট, ২০২৪ এবং ৩-১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ দুটি পর্যায়ে জেলার অভ্যন্তরে ব্লক স্তর পর্যন্ত সাংগঠনিক কাঠামোকে সক্রিয় করা এবং সদস্যভুক্তির লক্ষ্যমাত্রা পূরণে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে যৌথ সাংগঠনিক সফরসূচী অনুষ্ঠিত হবে।

(ঘ) আগামী ১৪-২০ জুলাই, ২০২৪ অরণ্য সপ্তাহ প্রতিপালনের উদ্যোগ নিতে হবে। ব্লক, পঞ্চায়েত, চা বাগান কলোনী, জাতিগতভাবে পিছিয়ে থাকা এলাকায় অবস্থিত প্রাথমিক / মাধ্যমিক স্কুল চিহ্নিত করে বৃক্ষরোপণের পরিকল্পনা নিতে হবে। প্রয়োজনে শিক্ষক সংগঠনের সাথে আলোচনা করে স্থান নির্ধারণ করতে হবে।

(ঙ) পূর্ব সিদ্ধান্ত মতো কমরেড অরবিন্দ ঘোষ ও শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য জন্মশতবর্ষ অধিকাংশ জেলায় যথাযথ মর্যাদা দিয়ে শিক্ষামূলক আলোচনার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়েছে। যেসব জেলায় এই কর্মসূচী রূপায়ণ করা সম্ভব হয়নি, সেখানে দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।

(চ) আগামী অক্টোবর, ২০২৪-এর মধ্যে বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সলিল চৌধুরী ও মৃণাল সেনের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন কর্মচারী ও তার পরিবার-পরিজনকে যুক্ত করে করতে হবে।

সাংগঠনিক করণীয় ঃ

(ক) সদা সমাপ্ত রাজনৈতিক সংগ্রাম-উত্তর পরিস্থিতিকে ভেদ

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

দক্ষিণ থেকে বামে ফ্রান্স

বিদ্যুৎ দাস

গত ২৬ জুলাই থেকে ফ্রান্স অলিম্পিক গেমস শুরু হয়েছে। ফরাসিরা সহ মেতে উঠেছে বিশ্বাসী। অথচ ফরাসী আইনসভা নির্বাচনে দেশজুড়ে এমন রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার আবহ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই প্রথম ফ্রান্সের সংসদীয় নির্বাচনে দক্ষিণপন্থীদের ভরাডুবি ঘটল। গত ৯ জুন নিওফ্যাসিস্ত দ্বারা প্রভাবিত চরম দক্ষিণপন্থী দল ন্যাশনাল র‍্যালি (আর এন) ইউরোপীয় সংসদ নির্বাচনে ৩১.৩৭ শতাংশ ভোট পেয়ে শীর্ষস্থানে উঠে আসে। এই ফলাফল ঘোষণার পর ফরাসী প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রোঁ তড়িঘড়ি ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি ভেঙে দেন। ঘোষিত হয় ৩০ জুন প্রথম দফা নির্বাচনের দিন। নির্বাচনের ফলাফলে সমালোচকদের বক্তব্যকে সঠিক প্রমাণ করে অতি দক্ষিণপন্থী আর এন ৩৩ শতাংশ ভোট অর্জন করে। কিন্তু কোনও প্রার্থী মোট ভোটের ৫০ শতাংশ অর্জন করতে না পারায় ভোট দ্বিতীয় দফায় গড়ায়। ৭ জুলাই দ্বিতীয় দফার ভোট গ্রহণ করা হয়।

প্রথম দফা নির্বাচনের আর এনের জয়ের পর বিভিন্ন জনমত সমীক্ষায় বলা হয়েছিল দ্বিতীয় দফা নির্বাচনেও দলটি সহজেই জয় পাবে। প্রথম দফা জোটের পর অভিবাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্বাচনী প্রচার করলে আর এনকে নিয়ে সমস্যায় পড়েন উদার ও মধ্যপন্থীরা, তাই আর এনকে থামাতে বামপন্থী ও মধ্যপন্থী জোটের সমঝোতা হয়। আর. এনের বিরুদ্ধে পড়া ভোটগুলি যেন একজনই পান, তাই নির্বাচনকে ত্রিমুখী থেকে দ্বিমুখী করতে জোটের তুই শতাধিক প্রার্থী যারা প্রথম দফায় তৃতীয় হয়েছে তাঁরা ভোট থেকে নিজেদের সরিয়ে নেয় এবং বাম ও মধ্যপন্থীদের এই কৌশল কার্যকরী হয়।

ভোটের ফলাফলে দেখা যায় মোট ভোটদান করেছেন ৪ কোটি লক্ষ ভোটার (৬৭ শতাংশ)। পূর্বাভাস মিথ্যা প্রমাণ করে নবনির্মিত বামপন্থী জোট নিউ পপুলার ফ্রন্ট প্রথম স্থানে উঠে আসে। তারা পায় মোট ৫৭৭টি আসনের মধ্যে ১৮২টি আসন (২৬. শতাংশ ভোট), দ্বিতীয় স্থান পায় মধ্যপন্থী, রাষ্ট্রপতি ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর দল এনসেম্বেল অ্যালায়েন্স। তারা পায় ১৬৮টি আসন (২২.৩ শতাংশ ভোট) এবং তৃতীয় স্থানে চলে যায় ন্যাশনাল রালি (আর. এন)। তারা ১৪৩টি আসন পায় (৩৭.৩ শতাংশ ভোট পায়। দ্য রিপবালিক্যান পায় ৬০টি আসন।

৪টি মূল ব্লক এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। এই ব্লকগুলি হল—১। বামপন্থী নিউ পপুলার ফ্রন্ট (এল এফ পি)। এই জোটে ফ্রান্স আনবোড (কট্টর বামপন্থী দল), সোশ্যালিস্টরা (সমাজতান্ত্রিক), গ্রিন পার্টি (পরিবেশবাদী) এবং কমিউনিস্টরা। এই দলের নেতা জ্যাঁ লুক মেলোশোঁর। ২। মধ্যমন্থী বা উদারবাদী রাষ্ট্রপতি ইমানুয়েলে ম্যাক্রোঁর দল এনসেম্বেল অ্যালায়েন্স, ৩। ফরাসী ফ্যাসীবাদ নেতা মেরিন লি পেনের দল ন্যাশনাল রালি (আর. এন)। ৪। দ্য রিপাবলিকান।

দ্বিতীয় ও চূড়ান্ত দফা নির্বাচনে জয়লাভের লক্ষ্যে নিউ পপুলার ফ্রন্ট ১৫০ দফা করনীয় ঘোষণা করে ফরাসী ভোটারদের মধ্যে। তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কিছু কল্যানকামী সামাজিক পদক্ষেপ টিকিয়ে রাখা হবে। নয়া উদারবাদী পদক্ষেপ কিয়দংশে প্রত্যাহার করা হবে, বিশেষ করে ব্যয় সঙ্কোচের নীতি। কার্যত এক বিকল্প অর্থনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে এই ফ্রন্ট। উল্লেখযোগ্য প্রতিশ্রুতিগুলি হল, সরকারী কর্মচারীদের বেতন ১০ শতাংশ বৃদ্ধি করা হবে, বিনামূল্যে স্কুলের মধ্যাহ্নভোজ সরবরাহ করা হবে, সুপরিবহনের সুবিধা প্রদান করা হবে, বর্তমান পেনশন ও অভিবাসন আইন সংশোধন করা হবে, আবাসন নির্মাণে ১৫ শতাংশ ভরতুকি দেওয়া হবে, অতিরিক্ত লভ্যাংশের ওপর নতুন করে কর চালু করে এবং আর্থিক সম্পত্তির উপর সম্পদ কর বসিয়ে অর্থ সংগ্রহ করা হবে, খাদ্য সামগ্রী ও জ্বালানীর দাম বেঁধে দেওয়া হবে, ন্যূনতম বেতন ঘোসণা করা হয়, ছোটো সংস্থার ক্ষেত্রে ভর্তুকি সহ ন্যূনতম মজুরি ১৪ শতাংশ বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। ২০২৩ সালে ঘেষিত সরকারী কর্মীদের অবসরের বয়স ৬৪ থেকে কমিয়ে ৬০ বছর করা হবে, পরিবারগুলোকে সর্বোচ্চ ১ কোটি ২০ লক্ষ ইউরোর উত্তরাধিকারী হওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে, করের ঘাটতিগুলো মিটিয়ে আয়করকে আরো উদার করা হবে, আরো শিক্ষক ও স্বাস্থ্য কর্মী নিয়োগ করা হবে এবং বাড়ি তাপরোধী করতে ভরতুকী দেওয়া হবে।

বামজোট নিউ পপুলার ফ্রন্ট গঠন করে নব্য উদারবাদকে এড়িয়ে গিয়ে এক বিকল্প অর্থনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ করে সফল হয়েছে। যদিও সরকার গঠনের জন্য ২৮৯ আসন কোনো জোটই পায়নি।

রাষ্ট্রপতি ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর মধ্যপন্থী বা উদারবাদী দল এনসেম্বেল অ্যালয়েন্স-এ ফরাসীদের বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দেয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ২০২৭ সালের মধ্যে বাজেট ঘাটতি তিন শতাংশ পর্যন্ত কমাতে চায়, যা নিয়ে দেশের অডিটর জেনারেল ও আই এস এফ সন্দেহ প্রকাশ করে। ২০২৫ সাল থেকে বিদ্যুতের বিলে ১৫ শতাংশ শুল্ক কমানো এবং মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির সঙ্গে অবসরকালীন ভাতা বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। যদিও নয়া উদারনীতির শর্তানুযায়ী ব্যয় সঙ্কোচের নীতি রূপায়ণ করেছিলেন ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। ম্যাক্রোঁর সরকার ধনীদের উপর কর চাপাতে উদ্যোগ গ্রহণ করেনি, সমস্ত করের বোঝা চাপিয়ে দেয় শ্রমজীবী মানুষের উপর, কর্মচারীদের অবসরের বয়স ৬০ থেকে ৬৪ বছর করে দেয়। শ্রমিক-কর্মচারী, কৃষকরা এইসব পদক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন। শ্রমিকদের মাসাধিককাল আন্দোলন এবং ইলো ভেস্ট আন্দোলন ম্যাক্রোঁ সরকারের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে।

ফরাসী ফ্যাসিবাদী, অতি দক্ষিণপন্থী নেতা মেরিন লেপেনের দল ন্যাশনাল র‍্যালি (আর. এন) দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে ফেবারিট ছিল। কিন্তু তারা তৃতীয় স্থান দখল করে। লেপেনের দল বা লে পেন কখনোই পেনসন সংস্কারের বা অবসরের বয়স বাড়িয়ে দেওয়ার বিরোধিতা করেনি। বড় কর্পোরেট কোম্পানিগুলো আর. এনকে প্রকাশ্যে সমর্থন করেছে। লে পেনের নয়া উদারবাদের উগ্র সমর্থন ও বিভাজনের রাজনীতি মানুষকে ভীত ও সচকিত করে তুলেছিল। পেনের পার্টির প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী জর্ডন বারদেল্লা ফিনান্স পুঁজির কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। ফরাসী জনগণ উগ্র দক্ষিণপন্থীদের দ্বিতীয় স্থানে পাঠিয়ে দেওয়ার পরেও আর এস নেতা লে পেন বলেন, এবারের নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে ভবিষ্যৎ-এর জন্য বীজ বপন করে রেখেছে আর. এন। পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন ২০২৭ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে লে পেন অংশগ্রহণ করবেন। আসলে মানুষ ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদদের ভুলে যাননি এবং তারা ওই অধ্যড়দ্ধায়ের পুনরাবৃত্তি চাননি।

ফ্রান্সের এই নির্বাচন দেখিয়ে দিয়েছে ফাসী সমাজ কিভাবে বিভক্ত হয়েছে। যদিও লে পেনের দল আসনের দিক থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি, কিন্তু মানুষের সমর্থনের প্রবণতা / হার আর. এনের দলের দিকেই আছে। এই ঘটনা থেকে বোঝা যায় কিভাবে উগ্র দক্ষিণ পন্থার মতাদর্শ সমাজের গভীরে প্রোথিত হয়ে আছে। এই বিভাজন নতুন সরকারে গঠনেও ভূমিকা পালন করবে, অন্যদিকে ম্যাক্রোঁও ক্ষমতা থেকে সরে আসতে রাজি নয়। তাঁর হঠাৎ নির্বাচন ঘোষণা তাঁকে বেকায়দায় ফেলেছে। ফরাসি শাসক শ্রেণীও চায় রক্ষণশীল দক্ষণিপন্থী ও উগ্র দক্ষিণপন্থীরা মিলিতভাবে বামপন্থীদের সরকার গঠন থেকে দূরে রাখুক। এরকম জোট তাঁদের স্বার্থে নয়া উদারনীতি প্রণয়ন করতে সাহায্য করবে।

ফরাসী জনগণ ব্যাক্রোঁ ও লে পেনের দলের / জোটের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন। তাঁদের মতামত স্পষ্ট হয়েছে উগ্র দক্ষিণপন্থা ও নয়া উদারবাদী অর্থনৈতিক নীতির বিরুদ্ধে। যদিও উগ্র দক্ষিণপন্থা পুরোপুরি পরাস্ত হয়নি। এখনকার মতো গতিহীন হয়ে পড়েছে মাত্র। কোট জোট সরকার গড়বে তা স্পষ্ট না হলেও ফ্রান্সের সংবিধান অনুযায়ী আগামী বারো মাসের মধ্যে ম্যাক্রোঁ নতুন পার্লামেন্ট নির্বাচনের আয়োজন করতে পারবে না। সংবিধানে বলা আছে রাষ্ট্রপতি যাঁকেই সরকার গঠনের জন্য বেছে নেবেন তাঁকেই জাতীয় পরিষদে আস্থা ভোটের মুখোমুখি হতে হবে।

নয়া পপুলার ফ্রন্টের মধ্যেও ক্ষমতার ভাগাভাগি সম্পর্কে মতানৈক্য আছে। মেলোশোঁকে নেতা হিসাবে মেনে নিতে রাজি নয় গ্রিন পার্টি ও সোশ্যালিস্ট পার্টি। যদিও মেলোশোঁর পার্টি সর্বোচ্চ আসন পেয়েছে। মেলোশোঁর দল 'অতি বাম' এবং পুঁজিবাদ বিরোধী বলে পরিচিত। অন্যদলগুলির সাথে তীব্র মত পার্থক্য আছে। এই ধরনের বিরোধকে ব্যবহার করার চেষ্টা চলছে এবং তাদের ভাঙিয়ে নিয়ে মধ্য বামপন্থী সরকার গঠনের সম্ভাবনাকে ধ্বংস করার চেষ্টা চলছে বিরোধী জোট ও শাসকশ্রেণির পক্ষে।

এই নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে ফরাসী জনগণ প্রমাণ করলেন য়া উদারবাদের বিকল্প একটি অর্থনৈতিক কার্যক্রম গ্রহণ করলে নয়া উদারবাদকে অতিক্রম করা যায় এবং সেটাই ফ্যাসিবাদের পায়ের তলা থেকে জমি কেড়ে নেওয়ার অন্যতম রাস্তা, পাশাপাশি রক্ষা করেছে ফ্রান্সের দীর্ঘদিনের মূলনীতি স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব। □

কমরেড অরবিন্দ ঘোষ ও কমরেড শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্যর জন্মশতবর্ষে কেন্দ্রীয় আলোচনা সভা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতি সমূহের "রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি"-র গঠনপর্বের অন্যতম দুই কাণ্ডারী কমরেড অরবিন্দ ঘোষ ও কমরেড শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্যর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয় বিগত ২১ জুন, ২০২৪ বিকাল ৫.৪৫-এ সংগঠনের কেন্দ্রীয় দপ্তর কর্মচারী ভবন-এর অরবিন্দ সভাকক্ষে। "পরিস্থিতির নিরিখে কার্যক্রম নির্ধারণের শিক্ষা শীর্ষক" আলোচনা সভায় মূল আলোচক ছিলেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক স্মরজিৎ রায়চৌধুরী। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মানস দাস।

প্রারম্ভিক বক্তব্য উত্থাপন করতে গিয়ে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী বলেন সংগঠনের গঠনপর্বের অন্যতম যে দু'জন নেতৃত্বের জন্মশতবর্ষে আমরা তাদের সাংগঠনিক গুণাবলী নিয়ে আলোচনা করছি তা শিক্ষণীয়। ১৯৬২ এবং ১৯৬৪ সালে সম্মেলন থেকে সংগঠনের পথচলার দিকনির্দেশ স্থিরিকৃত হলেও ১৯৬৮ সালে সম্মেলন থেকে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সংবিধান বা নিয়মাবলী তৈরি হয় তখন Object যেটা ছিল অর্থাৎ প্রথম যে আহ্বান জানানো তা হল "Enjoyment of Full Trade Union & Democratic Rights" এবং এই দাবিটা আমাদের নিয়মাবলীর মধ্যে যুক্ত করা হল। যখন ২০টি সংগঠনকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে কো-অর্ডিনেশন কমিটির পথচলা শুরু হয় এবং যখন অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়া নিয়ে ধারাবাহিক আন্দোলন কর্মসূচী সংগঠিত হয়, তখন আন্দোলন করার জন্য নেতৃত্বরা বরখাস্ত হন, মিথ্যা মামলায় নেতৃত্বদের জড়িয়ে দেওয়া হয়। বহু আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে সেই সংগ্রাম একটা সময়ে যখন পরিবর্তিত পরিস্থিতির ওপর দাঁড়িয়ে নেতৃত্বরা উপলব্ধি করেন যে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক দাবি দাওয়ার ওপর সীমাবদ্ধ থেকে সংগঠনকে বেশি দিন এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না। গণআন্দোলনের সঙ্গে এর সম্পৃক্তকরণ করতে হয়, সাধারণ মানুষের দাবিদাওয়াকে যুক্ত করে নিয়ে। সেই সময়ে যে কালা সার্কুলার ছিল যার দ্বারা কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া, সংগঠিত হওয়া, মিছিল-মিটিং করার অধিকার সম্পূর্ণরূপে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল তার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ভাবে সংগ্রাম এবং দাবি আদায়ের উপযুক্ত পরিবেশ যদি তৈরি করতে হয়, তাহলে কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকারটা সব থেকে বেশি প্রাধান্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সে সময়ে অর্থনৈতিক দাবি দাওয়ার প্রশ্নে যে আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল কমরেড অরবিন্দ ঘোষ ও কমরেড শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্যর মতো সুযোগ্য নেতৃত্বদের হাত ধরে সেক্ষেত্রে অর্থনৈতিক দাবি দাওয়া প্রাথমিক শর্ত হিসাবে থাকলেও তাকে রাজনৈতিক দাবিতে রূপান্তর করা, শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে লড়াই-আন্দোলন সংগঠিত করা সেই প্রক্রিয়া তারা গ্রহণ করেন। ১৯৮২ সালে সংগঠনের সপ্তম সম্মেলন কৃষ্ণনগর শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেখানেও আমাদের নিয়মাবলীর যখন পরিবর্তন করা হয় সেই নিয়মাবলীতেও উল্লেখিত ছিল যে কর্মচারীদের নিজেদের মধ্যে ও সারা দেশের শ্রমজীবী মানুষের সাথে সৌভ্রাতৃত্ব ও শুভেচ্ছার ভাব সৃষ্টি করা এবং তা বৃদ্ধি করা। কর্মচারীদের চিন্তা-চেতনা ও সাংস্কৃতিক মানের উন্নয়ন ঘটিয়ে বৃহত্তর গণতান্ত্রিক সংগ্রামে তাদের সামিল করা। সংগঠনের লক্ষ্য ছিল যে শুধুমাত্র নিজস্ব দাবি দাওয়ার ভিত্তিতে নিজ অংশের শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলন নয় সেই ক্ষোভকে আরও প্রসারিত করা দরকার। সে কারণেই অষ্টম রাজ্য সম্মেলন থেকে যে শ্লোগান, যে আহ্বান এসেছিল "দুনিয়া জোড়া শ্রেণীদ্বন্দ্বে আমরা নিরপেক্ষ নই, আমরা সমাজতন্ত্রের পক্ষে"—এই শ্লোগানটা আমরা মূলত দিয়ে থাকি। কিন্তু সেই সম্মেলনে প্রকৃত যে আহ্বানটা ছিল সেটা হল "দুনিয়া জোড়া শ্রেণীদ্বন্দ্বে আমরা নিরপেক্ষ নই, আমরা চাই শোষণহীন নির্মল সমাজ। তাই আমরা সমাজতন্ত্রের পক্ষে"। অর্থাৎ এই যে ক্যাপশনটা ছিল কিন্তু কী কারণে কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে সেটা সুনির্দিষ্টভাবে সেখানে উল্লেখিত হয়েছিল যে আমরা চাই শোষণহীন নির্মল সমাজ তাই আমরা সমাজতন্ত্রের পক্ষে। অর্থাৎ আমাদের যে লড়াই আন্দোলন বিভিন্ন পরিস্থিতি উপযোগী, পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সেই যৌথ আন্দোলনকে প্রসারিত করা এবং শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থকে সর্বাধিকার দিয়ে সর্বাগ্রে রেখে সেই লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সেই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই আজকেও আমাদের সংগঠন নানা ঘাত-প্রতিঘাত, নানান প্রতিকূলতার সম্মুখীন হচ্ছে পরিস্থিতিজনিত কারণে। সেই সময়ে তারা যে লড়াই আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন তার সামনে শত্রু চিহ্নিতকরণ ছিল, আর আজকের এই প্রজন্মের সামনে শত্রু শুধুমাত্র Physically Invisible-তাই নয়, আজকের আক্রমণ বহুমাত্রিক আক্রমণ। যত না শারীরিক আক্রমণ তার চেয়ে বেশি মানসিক আক্রমণ। প্রশাসনিক Structure-এর মধ্যে আক্রমণ, যার মধ্য দিয়ে আমাদের সংখ্যার শক্তি ক্রমশ হ্রাসমান হচ্ছে। স্থায়ী কর্মচারীর পরিবর্তে অস্থায়ী অনিয়মিত কর্মচারীর সংখ্যা বাড়ছে। শোষণমুক্ত সমাজের পরিবর্তে শোষণের মাত্রা যখন আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম আরও বেশি করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন এবং সেই এগিয়ে নিয়ে যেতে গেলে আমাদের পূর্বতন নেতৃত্বদের যে সংগ্রামী ভূমিকা সেই ইতিহাসকে যেমন চর্চা করা প্রয়োজন, তেমনি সেই চর্চার মধ্য দিয়ে আগামী দিনের পথচলা এই পরিস্থিতির নিরিখে দাঁড়িয়ে তা নির্ধারণ করার দায়িত্বটা আমাদের ওপর বর্তায়। আগামী দিনে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে এই সময়ে দাঁড়িয়ে যে পরিস্থিতি সেখানে দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ছাড়া পরিস্থিতিকে ভেদ করা কখনই সম্ভব নয়। অত্যাচারীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থেকে লড়াই আন্দোলন করাই একমাত্র পথ। কোন ভাবে, কোন পন্থায়, কোন কৌশলে লড়াই সংগঠিত করব তা আমাদের আগামী কাউন্সিল সভা থেকে নির্ধারিত হবে। কিন্তু যে পথই নির্ধারিত হোক Ultimately Task একটাই রাস্তায় নেমে আন্দোলন। সেই প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ছাড়া ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম ছাড়া, সমস্ত অংশের কর্মচারীকে যুক্ত করে সংগ্রাম ছাড়া এই পরিবর্তিত পরিস্থিতির গুণগত পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব নয়। নিশ্চয় আমরা সেই দিকেই, সেই লক্ষ্যেই আজকের এই আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে নিজেদেরকে সমৃদ্ধ করব এবং আগামী দিনের পথচলার ক্ষেত্রে তাকে ধারন করেই আমরা এগিয়ে যাব

স্মরজিৎ রায় চৌধরী

কাঙ্খিত লক্ষ্যের দিকে। এই প্রত্যাশা রেখে উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে সাধারণ সম্পাদক তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

আলোচনা সভার মূল আলোচক রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক স্মরজিৎ রায়চৌধুরীকে পুষ্পস্তবক দিয়ে সম্বর্ধিত করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী ও যুগ্ম সম্পাদক দেবব্রত রায়। আলোচনা সভার শুরুতেই স্মরজিৎ রায়চৌধুরী রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বকে ধন্যবাদ জানান রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের দু'জন প্রবাদপ্রতীম নেতৃত্ব কর্মচারী আন্দোলনের অগ্রপথিক কমরেড অরবিন্দ ঘোষ ও কমরেড শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য সম্পর্কে আলোচনা করার সুযোগ দেওয়ার জন্য যা তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে গর্বিত করেছে। তিনি বলেন, কমরেড অরবিন্দ ঘোষ এবং কমরেড শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য দুজনেই অবিভক্ত বাংলায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অরবিন্দ ঘোষের বাবা সরকারী কর্মচারী (রেজিস্ট্রেশন) হওয়ায় তার শৈশব ও কৈশোর কিছুটা নিরুদ্বেগে কাটলেও শ্যামসুন্দর ঘোষ-এর পরিবার তাঁর মাত্র ৯ বছর বয়সেই কলকাতায় চলে আসেন এবং অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যেই তাঁর শৈশব ও কৈশোর কাটে। পরবর্তীতে সাংসারিক ও পারিবারিক কারণে অরবিন্দ ঘোষকে তার লেখাপড়া ছেড়ে দিতে হয় এবং চাকরির সন্ধান করতে থাকেন। প্রথমে তিনি রেলের লোকোতে চাকরি পান এবং সেখান থেকেই তার ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সূত্রপাত। যদিও ছাত্র জীবন থেকেই তিনি রাজনীতির সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন এর একটা বড় কারণ অরবিন্দ ঘোষ-এর পিতা সরকারী কর্মচারী হলেও স্বাধীনতা আন্দোলনে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন, বিশেষত ভারত ছাড়ো আন্দোলনে। ১৯৪৫ সালে অরবিন্দ ঘোষ খাদ্য দপ্তরের রেশনিং বিভাগে যোগদান করেন কলকাতায়, পরবর্তীতে তাকে হুগলী জেলায় বদলী করে দেওয়া হয়। অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যেই শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য কলকাতার আশুতোষ কলেজ থেকে স্নাতকস্তরের পাঠক্রম শেষ করেন এবং ১৯৪৬ সালে কলকাতা হাইকোর্ট-এ তার কর্মজীবন শুরু করেন। ছাত্রজীবনে তিনি ছিলেন নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর অনুরাগী এবং তিনি নিয়মিত শরীর চর্চা করতেন। আই এন এ বন্দীদের বিচার সহ চল্লিশের দশকের উত্তাল পরিস্থিতি নেতাজীর অনুগামী শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্যের চেতনাকে রাজনৈতিকভাবে ঋদ্ধ করেছিল। পরবর্তীতে কর্মচারী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে তিনি শ্রমিকশ্রেণীর মতাদর্শেই দীক্ষিত হন এবং আমৃত্যু এই দর্শনে অবিচল ছিলেন। কমরেড অরবিন্দ ঘোষ ছাত্র জীবনেই শ্রমিক শ্রেণীর মতাদর্শে দীক্ষিত হন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি সেই অবস্থানেই অনড় ছিলেন। কমরের অরবিন্দ ঘোষ হুগলীতে অবস্থাকালেই রেশনিং দপ্তরের কর্মচারীদের সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৪৭ সালের ২৯ ডিসেম্বর সিকিউরিটি অ্যাক্ট পাশ করানোর প্রতিবাদে বিধানসভার বাইরে প্রতিবাদ ও জনসাধারণকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ লাঠি চালায়, টিয়ার গ্যাস ও গুলি চালায়। গুলিতে শিশির মণ্ডল নামে এক মেডিকেল ছাত্র নিহত হন এবং টিয়ার গ্যাসের সেল খাদ্য দপ্তর সহ বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে পড়ে, কর্মচারীরা আহত হন। এর প্রতিবাদে রেশনিং এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক আশু সামন্ত প্রেস বিবৃতি দেওয়ায় ৩০ ডিসেম্বর চাকরি থেকে বরখাস্ত হন। এই ঘটনার প্রতিবাদে ১৯৪৮ সালের ২ জানুয়ারি রেশনিং দপ্তরের কর্মচারীরা পেনডাউন করেন। ফলস্বরূপ বিভিন্ন দপ্তরে ছাঁটাই শুরু হয়। এই পরিস্থিতিতে ১৯৪৮ সালে ১০টি সমিতিকে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন তৈরি হয় এবং মুখপত্র প্রকাশনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, যার নাম হয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী। কর্মচারী আন্দোলনের চাপে সরকার এক কিস্তি মহার্ঘভাতা ঘোষণা করলেও যৌথ আন্দোলনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে কালা সার্কুলার 475-F জারি করে। কিন্তু তৎকালীন বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃত্বরা ভয় পেয়ে পিছিয়ে না গিয়ে কিছুটা কৌশল অবলম্বন করে যৌথ আন্দোলন গড়ে তোলার প্রক্রিয়া জারি রাখেন। এই সময় হাইকোর্ট কর্মচারী সমিতির অভ্যন্তরে বিভেদ তৈরি হয়। ওই সংগঠনের পদাধিকারীরা যৌথ আন্দোলনে অংশগ্রহণ না করার পক্ষে মত দেন, কিন্তু সাধারণ সদস্যরা ছিলেন যৌথ আন্দোলনের পক্ষে। সাধারণ সভায় পদাধিকারীদের মতামত খারিজ হয়ে গেলে হাইকোর্ট কর্মচারী সমিতির সকল পদাধিকারী একযোগে পদত্যাগ করেন। এই পরিস্থিতিতে কমরেড শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য এগিয়ে এসে সমিতির হাল ধরেন এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত এই দায়িত্ব তিনি পালন করেন। ১৯৫০ সালে সংবিধান রচিত হওয়ার পর সংগঠন আন্দোলন করার স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ১৯৫২ সালের ২৮ জুলাই কমরেড নরেন গুপ্ত, কমরেড অরবিন্দ ঘোষ-এর নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ খাদ্য সরবরাহ বিভাগ কর্মচারী সমিতি নামে নতুন সমিতি আত্মপ্রকাশ করে। এই সময় অরবিন্দ ঘোষ, শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্যর নেতৃত্বে যৌথ আন্দোলন গড়ে উঠতে থাকে। ১৯৫৬ সালে প্রথমে ২০টি পরবর্তীতে ২৮টি সমিতি নিয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে আত্মপ্রকাশ করে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। যার যুগ্ম আহ্বায়ক নির্বাচিত হন কমরেড শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য, অপর যুগ্ম আহ্বায়ক ছিলেন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের ভাই WBMOA সমিতির সাধারণ সম্পাদক সন্তোষ ওয়াদ্দেদার। ১৯৬২ সালে কলকাতার ত্যাগরাজ হলে অনুষ্ঠিত প্রথম সম্মেলন থেকে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন অরবিন্দ ঘোষ এবং যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য। ১৯৬৪ সালে দ্বিতীয় সম্মেলন থেকে কমরেড শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য সভাপতি নির্বাচিত হন এবং আমৃত্যু এই দায়িত্ব প্রতিপালন করেন। অপরদিকে অরবিন্দ ঘোষ ১৯৬২ সাল থেকে দীর্ঘ দু'দশক রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন (১৯৬৮ সাল থেকে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির বিভিন্ন পদাধিকার তৈরি হয়)। ১৯৬৬ সালে কমরেড অরবিন্দ ঘোষ ও কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের নেতৃত্ব কমরেড কে জি বোস-এর নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক কর্মচারী শিক্ষক আন্দোলনের যুক্তমঞ্চ ১২ই জুলাই কমিটি গঠিত হয় এবং কমরেড অরবিন্দ ঘোষ দীর্ঘ ১৮ বছর ধরে অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৪ সালে সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন (AISGEF) হায়দ্রাবাদে গঠিত হলেও তা আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে ১৯৬৫ সালে কলকাতার সুবর্ণবণিক সমাজ হলে কনভেনশনের মধ্য দিয়ে। দীর্ঘ সময় ধরে কমরেড অরবিন্দ ঘোষ AISGEF-এর সাধারণ সম্পাদক, চেয়ারম্যান ও প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮১ সালে কোনো আর্থিক সুবিধা ছাড়াই চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে তিনি রাজ্যসভার সাংসদ নির্বাচিত হন। কর্মচারী আন্দোলনের এই দুই প্রবাদপ্রতীম নেতা জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯২৪ সালে এবং দু'জনেই প্রয়াত হন ১৯৮৪ সালে। দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনে দু'জনেই ছিলেন কর্মচারীর একান্ত আপনজন। তাঁদের চাল-চলন, আচার-ব্যবহার, মেলামেশা ছিল অনুকরণীয়।

যে লড়াই আন্দোলন, ত্যাগ তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে তাঁরা সংগঠনকে মহিরূহে পরিণত করেছিলেন তা থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়ার দরকার। আজ যখন কর্মচারীর স্বল্পতা সাথে সাথে কর্মী স্বল্পতা আমাদের সামনে প্রধান সমস্যা, তখন আজকের দিনে আমার মনে হয় প্রধান দাবি হওয়া উচিৎ সমস্ত শূন্য পদে স্থায়ী নিয়োগের। একই সঙ্গে কর্মচারী মননে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠার লক্ষ্যে আমাদের আরও যত্নবান হওয়া দরকার। আর যেটা প্রয়োজন নিজ পরিবারে আপন মতাদর্শকে প্রয়োগ করা যা এই দুই নেতৃত্বই তাদের পরিবারের ক্ষেত্রে করতে পেরেছিলেন। আজকে যখন এক দমবন্ধ করা পরিস্থিতির মধ্যে আমরা সংগঠন পরিচালনা করছি, সেই সময় আমরা যদি সকলে মিলে চেষ্টা করি, নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে চেষ্টা করি তাহলে আমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী। পরিস্থিতি যে দিকেই যাক আমরা তার মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারব আর সেটাই হবে এই দুই প্রবাদপ্রতীম নেতৃত্বের শতবর্ষে আমাদের প্রকৃত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন এই বলে তিনি তার আলোচনা শেষ করেন। আলোচনা সভার মঞ্চে কমরেড অরবিন্দ ঘোষের পুত্র অভিজিৎ ঘোষ এবং কমরেড শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্যর পুত্র অমিত ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন। □

দেবাশীষ রায়

গণ অভ্যুত্থান

বাংলাদেশে শেখ হাসিনা সরকারের পতন

সম্প্রতি বাংলাদেশে সরকার বিরোধী গণঅভ্যুত্থানের নাটকীয় পরিণতিতে সে দেশের সরকারের পতন ঘটেছে এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। তিনি ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন। ৫ আগস্ট ২০২৪ প্রতিবাদী ছাত্রদের 'ঢাকা চলো' অভিযানে সাড়া দিয়ে হাজার হাজার মানুষ প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের দিকে রওয়ানা হয়। সেনা প্রধান প্রধানমন্ত্রী হাসিনাকে জানিয়ে দেন যে প্রতিবাদী সাধারণ মানুষের উপর তাঁরা গুলি চালাবেন না। এটাই ছিল একটি নড়বড়ে সরকারের পতনের আগে শেষ আঘাত।

এই গণ অভ্যুত্থানের সূচনা হয় বাংলাদেশের সরকারী চাকরীতে মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারের জন্য ৩০ শতাংশ সংরক্ষণের বিরুদ্ধে। হাসিনা সরকার প্রতিবাদী ছাত্রদের সাথে আলোচনা না করে প্রতিবাদকে কড়া হাতে দমনের চেষ্টা করে। এই সময়ে সুপ্রিম কোর্ট এই সংরক্ষণ ৫ শতাংশ করার রায় দেয়। দুই শতাধিক ছাত্র এবং সাধারণ নাগরিক পুলিশের গুলি এবং শাসক বাহিনীর গুণ্ডাদের আক্রমণে নিহত হন। সামান্য সময় আন্দোলন থেমে থাকার পর এই আন্দোলন আরও তীব্র হয়ে ওঠে নিরপরাধ ছাত্র ও নাগরিককে হত্যাকারীর শাস্তি এবং গ্রেপ্তার হওয়া সকল আন্দোলনকারীর মুক্তির দাবিতে। অতি দ্রুত এই দাবিগুলি রূপান্তরিত হয়ে একটা দাবিতে পরিণত হয়—প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদের পদত্যাগ।

শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামি লীগ ২০০৯ সালে ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন ঘটায়। তারপর থেকে ১৫ বছর ধরে ধীরে ধীরে স্বৈরাচারী শাসকে পরিণত হয়। এই সরকারের আমলে তিনটি সংসদীয় নির্বাচনে নানা অনিয়ম, বেনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। জানুয়ারি ২০২৪-এ সর্বশেষ নির্বাচনে রাষ্ট্র ক্ষমতার অপব্যবহার করে বিরোধীদের উপর দমনপীড়ন ও একতরফা নির্বাচন করার গণ অভিযোগ ওঠে। একটি স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা কায়েম হয় তখন, যখন সংবাদমাধ্যম, নাগরিক সমাজ সহ সকল বিরোধীরা আক্রান্ত হয় এবং প্রতিবাদী একটা অংশকে জেলে ঢোকানো হয়।

একথা অস্বীকার করা যাবে না হাসিনার পুনর্বার ক্ষমতায় আসার পর প্রথম দশ বছরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ঘটেছিল। মূলত পোশাক রপ্তানিকে কেন্দ্র করে জিডিপি বৃদ্ধি ঘটেছিল। কিন্তু এই বৃদ্ধির সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছোয় নি। উপরের দিকে সীমাবদ্ধ ছিল। এর ফলস্বরূপ বর্তমানে সে দেশে ১ কোটি ৮০ লক্ষ বেকার যুবক-যুবতী কাজের খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে চরম দুর্নীতি। দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী এবং শাসক দলের নেতাদের অশুভ চক্র সরকারকে মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীদের থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। এর ফলস্বরূপ সংরক্ষণবিরোধী ছাত্র আন্দোলন এক গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয় এবং সরকারের পতন ঘটে।

তবে বিপদের দিক হল এই প্রতিবাদ আন্দোলনে জামাত-এ-ইসলামির ছাত্র সংগঠন এবং অন্যান্য মৌলবাদী ও দক্ষিণপন্থী সংগঠনও যুক্ত ছিল। শেখ হাসিনার আকস্মিক বিদায়ের পর বাংলাদেশে কার্যত নৈরাজ্য দেখা দেয়। আওয়ামী লীগের দপ্তর, থানা ইত্যাদি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। সরকার পড়ার দু'দিনের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় হিন্দু মন্দিরে আক্রমণ, সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণের খবর পাওয়া গেছে। মৌলবাদী শক্তি উদ্ভুত পরিস্থিতিকে ব্যবহার করে জনগণকে বিপথে চালিত করে সংখ্যালঘুদের লক্ষ্য বানাতে চাইছে। যা আমাদের কাছে অবশ্যই আশঙ্কার এবং উদ্বেগের।

বর্তমানে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা নোবেল জয়ী মহম্মদ ইউনিসকে প্রধান উপদেষ্টা করে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়েছে। এই অন্তর্বর্তী সরকার দ্রুত সে দেশে সংসদীয় নির্বাচনের আয়োজন করে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করুক এটাই সবাই চায়। □

মানস বড়ুয়া

নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতি মোকাবিলায় সংগ্রামই একমাত্র পথ

বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী

দেশের জনগণের কাছে সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনী সংগ্রাম ছিল ভারতের সংবিধান ও দেশের সাধারণতন্ত্রের ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক চরিত্রকে রক্ষা করার সংগ্রাম। অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব, সামাজিক ন্যায় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রভৃতি সংবিধানের মৌলিক স্তম্ভগুলিকে রক্ষার স্বার্থে দেশের জনগণের দৃঢ় অবস্থানের জন্যই বিগত ১০ বছর ধরে নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় জয়ী দেশের শাসকদলকে তার অভীষ্ট সংখ্যা হারিয়ে অন্যান্য শরিক দলগুলির উপর নির্ভরশীল হতে হল। তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করে নরেন্দ্র মোদি দেশের সংবিধানের প্রতি তাঁর মেকি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে নিজেকে প্রচারের আলোকে তুলে ধরতে চেষ্টার ত্রুটি রাখেননি। কিন্তু তা বলে দেশকে হিন্দুত্ববাদী ফ্যাসিস্ট একনায়কতন্ত্রী রাষ্ট্র গঠনের ভাবনা থেকে আর এস এস'র একান্ত অনুগত বিনম্র থাকবে, এ ভাবনা ভাবাই ভুল।

হিন্দু সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের আদর্শগত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে ভারতের বুকে হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিজেপির রাজনৈতিক শাখা আর এস এস। ভারতের জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম তথা স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল ধারার বাইরে উগ্রজাতীয়তাবাদী ও হিন্দুত্ববাদী এই শক্তির আবির্ভাব হয়। ইতালির মুলোলিনির ফ্যাসিস্ত সংগঠনের আদলে গড়ে ওঠা আর এস এস নিজেদের সাংস্কৃতিক সংগঠন হিসাবে দাবি করলেও এবং সরাসরি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত না হলেও তাদের সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্য রয়েছে। আর সেই রাজনৈতিক লক্ষ্য পূরণের জন্য সমাজের নানা অংশে, নানা স্তরে, নানা সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষকে মানসিকভাবে হিন্দুত্ববাদী ভাবনায় অনুপ্রাণিত ও উদ্দীপিত করার কাজে লিপ্ত। হিন্দুত্ববাদী ভাবনাগুলিকে জনপরিসরে প্রতিষ্ঠিত করতে গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ভাবনার পরিবর্তে ধর্মভিত্তিক একদলীয় স্বৈরতান্ত্রিক উগ্র জাতীয়তাবাদী ভাবনা প্রচারই তাদের প্রধান কাজ। এই লক্ষ্যে তারা শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, মহিলা সহ সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে কাজ করার জন্য পৃথক পৃথক সংগঠন চালায়। সম্প্রতি সরকারী কর্মচারীদের আর এস এস'এ যোগ দেওয়ার উপর ১৯৬৬ সালে জারি করা নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয় কেন্দ্রীয় সরকার। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে হত্যার দায়ে সর্দার বল্লবভাই প্যাটেল আর এস এস'র উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন। জাতীয়তাবাদী সংগঠনের নামে সরকারী কর্মচারীদের আর এস এস'এ যোগদানের সুযোগ আদতে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলির উপর কর্তৃত্ব স্থাপন, যা সংবিধান অবমাননার সমতুল্য।

নয়া উদারবাদী জমানায় পুঁজিবাদের বর্তমান সঙ্কট নির্দিষ্টভাবে সিস্টেমিক ক্রাইসিস। নয়া উদারবাদী পথে এই অর্থনৈতিক সঙ্কট দীর্ঘস্থায়ী এবং সিস্টেমিক ক্রাইসিসের মধ্যে আটকে থাকা পুঁজিবাদ মানুষের জীবন ধারণের সঙ্কট সমাধানের কোনো অর্থনৈতিক পথ দেখাতে পারে না বলেই রাজনৈতিক সমাধানের কৌশল নেয়। এই রাজনৈতিক সমাধানের বৈশিষ্ট্য হল অতি দক্ষিণপন্থা। সঙ্কটে দীর্ণ সমাজে মূল অর্থনৈতিক সমস্যাকে আড়াল করে মানুষকে জাত, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, সম্প্রদায়, লিঙ্গ ইত্যাদি পরিচয়ের ভিত্তিতে বিভক্ত করে মৌলিক সমস্যা সমাধানের রাস্তাকে ধ্বংস করা। যাতে সঙ্কটের মূল কারণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের পথকে প্রাধান্য না দিয়ে মানুষ বিভিন্ন পরিচয়ের ভিত্তিতে নিজেদের মধ্যে লড়াইকে প্রাধান্য দেয়। এর সুযোগে সুরক্ষিত থাকে লগ্নীপুঁজির শোষণ ও লুণ্ঠন। শ্রমজীবী মানুষকে বিভক্ত করতে এটি দক্ষিণপন্থী ও অতি দক্ষিণপন্থী শক্তির হাতিয়ার। ভারতের অতি দক্ষিণপন্থী শক্তির বৈশিষ্ট্য হল রাজনৈতিক হিন্দুত্ব। দেশের শাসক গোষ্ঠী এই হাতিয়ারকে ব্যবহার করেই ভারতের বহুত্ববাদী বৈশিষ্ট্যকে ধ্বংস করতে চায়।

এবারের অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনে ভারত ভাবনাকে রক্ষা করার লড়াইয়ের অন্যতম একটি প্রধান উপাদান ছিল খেটে খাওয়া মানুষ ও সাধারণ জনগণের জীবন-জীবিকার দাবি। সেদিক থেকে দেখতে গেলে অর্থনৈতিক ইস্যুতে এবারের লড়াইটা ছিল লুণ্ঠনকারী কর্পোরেট হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

দেশের শাসকদল তৃতীয় বারের জন্য সরকার গঠন করলেও শক্তি কমেছে। বিগত ২০১৪ ও ২০১৯ সালের নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় জয়ী দেশের শাসক দলের শক্তি কিছুটা ক্ষয় হওয়ায় গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষ খানিকটা স্বস্তিবোধ করছেন। কিন্তু দেশ ও পশ্চিমবাংলার শাসকদল ও কর্পোরেট চালিত মিডিয়ার যৌথ প্রয়াসে রাজ্যে বামপন্থী শক্তিকে অপ্রাসঙ্গিক করার জন্য বাইনারি রাজনীতি সৃষ্টিতে দারুণভাবে ক্রিয়াশীল ছিল। এই কাজে তারা সফল। রাজ্যে বামপন্থীদের নিরাশাজনক ফলাফলে জনমানসে কিছুটা হতাশা সৃষ্টি করেছে। বামপন্থীদের উত্থাপিত দুর্নীতি ও দুষ্কৃতীরাজের বিরোধিতা এবং সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের জীবন জীবিকার দাবিকাগুলি বিকল্প অ্যাজেন্ডা হিসেবে জনমানসে উত্থাপিত হয়েছে। বিকল্প অ্যাজেন্ডার প্রতি মানুষের আকর্ষণ ও রুটি-রুজির সংগ্রাম আগামীতে বামপন্থার অগ্রগতির পথকে সুনিশ্চিত করবে। তবে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্ভব নয়। কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে ধারাবাহিক সংগ্রাম করতে হবে। জীবন-জীবিকার উপর আক্রমণ, বেসরকারীকরণ, শূন্যপদে অস্তায়ী নিয়োগ, মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে শ্রমজীবী জনগণের সংগ্রামকে প্রসারিত করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন অপরাপর অংশের সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন। রাজ্যের সামগ্রিক পরিস্থিতিতে অধিকার সম্পর্কে সচেতনতামূলক বার্তা পৌঁছে দেওয়া বা বোঝার দরকার ছিল, তা সবটা করা সম্ভব হয়নি। এর সুযোগে শাসকশ্রেণী বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে নির্ভরযোগ্য নয় বলে মানুষের মনে ধারণা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। এই অংশকে শাসক শ্রেণী বিভিন্ন কায়দায় জীবন-জীবিকার সংগ্রাম থেকে দূরে সরিয়ে দিতে তৎপর। কিন্তু নয়া উদারবাদী পৃথিবীতে কর্পোরেট লুঠ ও অতি দক্ষিণপন্থী রাজনীতির আবহে আক্রমণ শুধুমাত্র রাষ্ট্রায়ত্ব ক্ষেত্র বেসরকারীকরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। সমস্ত অংশের শ্রমজীবী মানুষের জীবন-জীবিকার উপর যে আক্রমণ নেমে আসছে তাকে প্রতিহত করতে হলে সংগ্রামই একমাত্র পথ। নির্বাচনী সংগ্রামে সাফল্য বা ব্যর্থতা একমাত্র মানদণ্ড নয়। সংসদীয় রাজনীতিতে বামপন্থীদের উপস্থিতি অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু এখানেই বামপন্থীদের কাজ শেষ নয়। শ্রেণী শক্তির ভারসাম্য শ্রমজীবী মানুষের অনুকূলে পরিবর্তন ঘটানোই প্রধানতম কাজ। মনে রাখা প্রয়োজন, জটিল পরিস্থিতিতে সহজ সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া যায় না। এটি দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম। বর্তমান বাস্তবতায় যে সম্ভাবনার দিকগুলি লুকিয়ে আছে তাকে খুঁজে বার করার যোগ্য হয়ে উঠতেই হবে। এর জন্য প্রয়োজন শক্তিশালী সংগঠন।

যে কোনো সংগঠনের শক্তি নির্ভর করে তার সদস্যের সংখ্যার উপর, সদস্যদের মননশীলতা, সাংস্কৃতিক চেতনার উপর। এর জন্য প্রয়োজন সংগঠনের আহ্বানে কর্মচারী স্বার্থবাহী দাবি আদায়ের সংগ্রামে যুক্ত হওয়ার বার্তা নিয়ে কর্মচারীর কাছে পৌঁছানো। দীর্ঘ মেয়াদী একাজে অসীম ধৈর্য নিয়ে কর্মচারীর আপনজন হতে হবে। প্রতিনিয়ত শোষণের তীব্রতা বাড়ছে। সংগঠিত ক্ষেত্র, অসংগঠিত ক্ষেত্র, বিভিন্ন পরিষেবার সাথে যুক্ত বিভিন্ন ধরনের চুক্তিতে নিযুক্ত কর্মচারী শোষিত হচ্ছেন। জমি, জঙ্গল, জল সবকিছুই কর্পোরেট দখল করে চলেছে। নানাভাবে উৎখাত হয়ে যাওয়া মানুষের সংগ্রাম বাড়বে। বর্তমান সময়ে নিরাপত্তাহীনতা স্বাভাবিক প্রবণতাতে পরিণত হয়েছে। ফলে সামাজিক সুরক্ষার দাবি গণআন্দোলন গড়ে তোলার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সরকারী পরিকাঠামোকে টিকিয়ে রাখা, সরকারী স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে বেসরকারী ব্যবস্থায় পরিণত করার চক্রান্তকে প্রতিহত করার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শ্রেণী চেতনা বিকশিত হতে পারে। আক্রান্ত, বঞ্চিত মানুষের আন্দোলন গড়ে তোলার মধ্য দিয়েই শ্রেণী ঐক্য গড়ে ওঠে। শাসকশ্রেণী শ্রমজীবী জনগণকে বিভক্ত করায় ও সংগ্রাম বিমুখতার দিকে ঠেলে দিতে চাইবে। একে মোকাবিলা করতে ব্যাপক সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে অবশ্যই নিজস্ব আদায়যোগ্য দাবি-দাওয়া নিয়ে, কর্মচারীদের সমস্যা নিয়ে আন্দোলন সংগঠিত করতে হবে। এরই সাথে কর্মচারীদের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রাখত হবে। শুধু কর্মচারীই নয়, তাদের পরিবার পরিজনদেরও সংগঠনের বৃত্তের মধ্যে টেনে আনতে হবে। আগামীদিনে ধর্মনিরপেক্ষতা বনাম সাম্প্রদায়িকতাবাদের মধ্যে তীব্র মতাদর্শগত সংগ্রাম সংগঠিত করতে হবে। একথা নিশ্চিত যে কর্মচারী তথা শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ বিরোধী আগ্রাসী কর্পোরেট ও সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়া শক্তিকে মোকাবিলা করতে প্রয়োজন তীব্র থেকে তীব্রতর আন্দোলন। আগামী দিনে সেই সংগ্রাম তীব্র করেই শ্রেণী ভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব। এটাই পরিস্থিতির চাহিদা। সেই সংগ্রাম গড়ে তুলতে। □

অমানবিক আক্রমণের শিকার নার্সিং কর্মচারীরা

একবার নয়, দু'বার নয়, বারে বারে একাধিকবার ঘটে চলেছে নার্সিং কর্মচারীদের উপর প্রশাসকদের আক্রমণের ঘটনা সারা রাজ্য জুড়ে। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্তর্ভুক্ত সমিতি ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সেস এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আমরা প্রতিবারই তীব্র প্রতিবাদ করি। আবারও এইরকম ঘটনা দেখা গেল নদীয়া, কোচবিহার সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায়।

রুরাল হসপিটাল, তাহেরপুর, নদীয়া

নদীয়া ঃ রানাঘাট ১নং ব্লকের অন্তর্গত তাহেরপুরের একটি রুরাল হাসপাতালের জি.এন.এম স্টাফ পূর্ণিমা বাইন গত ১৫ এপ্রিল '২৪ অসুস্থতার কারণে ছুটির আবেদন করেন প্রশাসনের কাছে। কিন্তু উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ছুটি মঞ্জুর না করে তাঁকে বাধ্য করেন কাজে যোগ দিতে এবং পরিবারকে উপেক্ষ করে কাজে যোগ দিতে বাধ্য হন। কাজে যোগ দিয়ে তিনি আবার খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে রানাঘাট হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গত ১৮ এপ্রিল '২৪ তিনি চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই প্রয়াত হন। একটি অমানবিক সিদ্ধান্তর জন্য কোনো সন্তান মাতৃহারা হল, স্বামী তার স্ত্রীকে হারালো, তাতে প্রশাসকের কি এলো গেল। জেলা ও মহকুমাগতভাবে আমাদের সমিতি যথাসম্ভব তাঁর পরিবারের পাশে থাকে। অপরদিকে প্রশাসকের এই অমানবিকতার তীব্র প্রতিবাদ করে জেলা ও মহকুমাগতভাবে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ কর্মসূচী প্রতিপালিত করা হয়। পরবর্তীতে ২৯ এপ্রিল সমিতি ও কো-অর্ডিনেশন কমিটি যৌথভাবে ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের (BMOH) কাছে Deputation দেয় ও ব্যাপক কর্মচারী জমায়েতের মধ্যে দিয়ে বিক্ষোভ কর্মসূচী প্রতিপালিত করে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ প্রশাসকের এই অমানবিক আচরণের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ না নেওয়ায় জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটি ও সমিতি যৌথভাবে জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের (CMOH) কাছে Deputation ও জমায়েতের কর্মসূচী আহ্বান করেছে।

কোচবিহার ঃ গত ৪ মে '২৪ কোচবিহারের এম জে এন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের Female Medicine Ward-এ কর্মরতা নার্সিং স্টাফ নিল্লু তামাং আক্রান্ত হন সহকর্মী কর্মরত ডাক্তার বিবেক রাই (PGT) দ্বারা। বেলা ২.১০ মিনিট নাগাদ একজন রোগীর রক্তের নমুনা সংগ্রহ করায় সমস্যা হওয়াতে উক্ত ডাক্তারের সাথে বচসা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য রক্তের নমুনা সংগ্রহ করার কথা প্যাথোলজি ডিপার্টমেন্টের। উক্ত বিষয়কে কেন্দ্র করে কর্মরত ডাক্তার নিল্লু তামাংকে অশ্লীল ও অভব্য ভাষায় গালিগালাজ করেন এবং তার (নিল্লু) গায়ে হাতও তোলেন। পাশাপাশি শারীরিকভাবেও হেনস্থা করেন। এই ঘটনায় সমস্ত কর্মচারী ক্ষুব্ধ হয়ে যায় এবং আতঙ্কিত হয়। গত ৬ মে '২৪ জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটি নেতৃত্ব ও সমিতির জেলা নেতৃত্ব যৌথভাবে হাসপাতালের MSVP ডাঃ রাজীব প্রসাদের কাছে Deputation ও জমায়েতের মাধ্যমে যৌথ ভাবে কর্মসূচী প্রতিপালিত করে ও বিক্ষোভ দেখায়। পরবর্তীতে MSVP একটি কমিটি গঠন করে বিষয়টিকে গুরুত্ব দেন ও ডাক্তার বিবেক রাইকে নিল্লী তামাং-এর কাছে apology চাইতে বাধ্য করেন।

এম জে এন মেডিঃ কলেজ ও হসপিটাল, কোচবিহার

পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ গত ৫ মে '২৪ পশ্চিম মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে 'মাতৃ-মা' বিভাগে রাত্রিবেলা ১০টা নাগাদ একদল মানুষ বিভিন্ন অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করেন কর্মচারীদের উপর। কারণ আগের দিন একটি ষোল বছরের গর্ভবতী মায়ের Post C/s-এ সেপ্‌সিস হয়ে মারা যায়। যে কোনো মৃত্যুই দুঃখজনক অবশ্যই। কিন্তু বিষয়টি হল এত বড় বড় হাসপাতাল বিল্ডিং হচ্ছে অথচ কর্মচারীদের কোনো নিরাপত্তা নেই। ৫ মে-তেও পশ্চিম মেদিনীপুর হাসপাতালে রাত্রিবেলা যখন গ্রামের মানুষ হাসপাতালে ঢুকে চড়াও হয়, তখন নার্সিং কর্মচারীরাই ডিউটি রুমে বা ওয়ার্ডে ছিলেন, কোনো সিকিউরিটি ছিল না, কার্যত তারা পরিস্থিতি দেখে পালিয়ে যায়। ডাক্তাররাও সরে গেছিলেন। শুধুমাত্র নার্সিং কর্মচারীরাই উপস্থিত ছিলেন এবং আক্রমণের শিকার হয়ে তারা ভয়ে নার্সিং সুপারের অফিসে চলে যায় নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে। পরবর্তীতে বিষয়টি নিয়ে আমাদের সমিতির নেতৃত্বরা ও জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক দুলাল দত্ত সহ অন্যান্য নেতৃত্ব তৎপরতার সাথে হাসপাতালের MSVP-র কাছে একটি Deputation দেন কর্মচারী জমায়েতের মধ্যে দিয়ে। MSVP মহাশয়ও বিষয়টি খুব গুরুত্ব সহকারে শুনেছেন ও পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

পঃ মেদিনীপুর মেডিঃ কলেজ ও হসপিটাল, মেদিনীপুর

লেডি ডাফরিন হসপিটাল, কলকাতা ঃ এই হাসপাতালেও দফায় দফায় বিভিন্নভাবে নার্সিং কর্মচারীদের উপর প্রশাসনিক আক্রমণ নামিয়ে আনা হচ্ছে। কর্মচারীরা উপস্থিত থাকা ও কাজ করা সত্ত্বেও প্রশাসক তাদের নামে অন্যায়ভাবে শুধুমাত্র অন্যায়ের প্রতিবাদ করার জন্য স্বাস্থ্যভবনে অভিযোগ করে শো-কজ করা হচ্ছে। সম্প্রতি একজন ত্রিপুরাবাসী male GNM Staff-এর সাথে কিছু অপ্রীতিকর ঘটনাকে কেন্দ্র করে সমিতির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে নার্সিং সুপারের কাছে একটি Deputation-এর কর্মসূচী গত ১৩ মে '২৪ প্রতিপালিত হয়। এই কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন হাসপাতালের ব্যাপক অংশের কর্মচারীরা Male-Female উভয়ই। হাসপাতালের নার্সিং সুপারকেও ঋর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সঠিক মর্যাদায় কাজ করায় অসহযোগিতা করেন। প্রসঙ্গক্রমে কর্মচারীদের উপর অন্যায় পদক্ষেপের কোনো সঠিক জবাব নার্সিং সুপার দিতে না পারায় তিনি হাসপাতাল সুপারের সাথে যোগাযোগ করলে, তিনি আমাদের সাথে আলোচনার জন্য ডেকে নেন। আমরা সুপারের সাথে ওনার পূর্ণ সহযোগিতায় আলোচনা করি সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে। এই সমগ্র আলোচনাপর্বে সমিতির সাধারণ সম্পাদিকা, প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদিকা ও কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

লেডি ডাফরিন হসপিটাল, কলকাতা

শুধুমাত্র এই কয়েকটি আক্রমণেই সীমাবদ্ধ নেই কর্মচারী সমাজ। দিকে দিকে এইভাবে অন্যায় আক্রমণ চলছেই। এখন কিন্তু কর্মচারীরা ভয় দূর করে প্রতিবাদের ময়দানে আসছে শুধুমাত্র রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি ও ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সেস এ্যাসোসিয়েশনের নেতৃত্বরা সদাসর্বদা কর্মচারীদের পাশে ছিল, আছে ও থাকবে এই আশা ভরসাতে। এটাই আমাদের অন্যতম সাফল্য। □

কুমকুম মিত্র

তৃতীয় পৃষ্ঠার পরে

বর্ধিত কাউন্সিল সভার আহ্বান

করার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে সব অংশের কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে সদস্য সংগ্রহ পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা পঞ্চাশ হাজারে পৌঁছাতে হবে। চুক্তি প্রথায় নিযুক্ত কর্মচারীদের সদস্য করার কাজ বর্ধিত দায়িত্ব নিয়ে করতে হবে।

(খ) সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড সুষ্ঠভাবে পরিচালনার স্বার্থে আগামী আগস্ট-সেপ্টেম্বর, ২০২৪ বেতন থেকে সংগঠন তহবিল সংগ্রহ করতে হবে। তহবিল সংগ্রহের হার ঃ

মোট বেতন ৩০,০০০ টাকা পর্যন্ত—১০০ টাকা

মোট বেতন ৩০,০০১ থেকে ৫০,০০০—২০০ টাকা

মোট বেতন ৫০,০০১ ও তদুর্দ্ধে—৩০০ টাকা

পারিবারিক পেনশনার্স ও চুক্তিতে নিযুক্ত কর্মচারীদের ৫০ টাকা।

সংগৃহীত অর্থ ৫৫ ঃ ৪৫ অনুপাতে কেন্দ্র ও জেলায় বণ্টিত হবে। একাধিক কুপন সংগৃহীত হতে পারে। তবে লক্ষ্য থাকবে প্রতিটি কর্মচারী বন্ধুর কাছে পৌঁছানো।

(গ) কর্মচারী ও তার পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর লক্ষ্য নিয়ে পারিবারিক বিন্যাস, এলাকাগত অবস্থান, পরিবারে উপার্জনশীল ব্যক্তির সংখ্যা, সরকারী প্রকল্পের উপভোক্তা থাকলে তার সংখ্যা ও প্রকল্পের নাম, সরকারী প্রকল্প পাওয়ার অধিকারী অথচ বঞ্চিত, পরিবারের অভ্যন্তরে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ইত্যাদি তথ্য সম্বলিত তথ্য ভাণ্ডার প্রস্তুত করতে হবে এবং যে কোনো প্রয়োজনে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে।

(ঘ) বিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চুক্তি / অস্থায়ী কর্মচারীদের সংগঠিত করার কাজ সম্পন্ন করতে হবে। অন্তর্ভুক্ত সমিতিকে চুক্তি / অস্থায়ী কর্মচারীদের সংগঠিত করার সাংগঠনিক প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।

(ঙ) প্রশাসনের অভ্যন্তরে সদস্য / কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

(চ) নির্বাচনী প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার প্রাথমিক কাজ সংশোধিত ভোটার তালিকা প্রস্তুতিতে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে বুথ স্তর আধিকারিকের দায়িত্বে যুক্ত হতে হবে। এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশাবলী যাতে যথাযথভাবে রূপায়িত হয়, সেদিকে নজর দিতে হবে।

(ছ) আগামী ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ প্রতিটি জেলায় ৫ দফা দাবিতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের উপস্থিতিতে জেলা শাসকের দপ্তরে দাবি প্রস্তাব পেশ ও কর্মচারী জমায়েত করে ডেপুটেশনের কর্মসূচী রূপায়ণ করতে হবে। দাবি আদায়ের এই দৃশ্যমান কর্মসূচীতে জেলার সব অংশের কর্মচারীকে উপস্থিত করানোর সর্বত্র প্রচার সংগঠিত করতে হবে। কলকাতায় ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ অঞ্চল ভিত্তিক 'দাবি দিবস' কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হবে।

দাবিসমূহ ঃ

১। রাজ্য প্রশাসনের সমস্ত শূন্যপদে স্থায়ী নিয়োগ স্বচ্ছতার সাথে পূরণ করতে হবে।

২। চুক্তি ভিত্তিক ও অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ করতে হবে।

৩। অবিলম্বে বকেয়া মহার্ঘভাতা / মহার্ঘ রিলিফ প্রদান করতে হবে।

৪। স্বাস্থ্য প্রকল্পের ঊর্ধ্বসীমা বৃদ্ধি করে ৫ লক্ষ টাকা করতে হবে এবং বেসরকারী স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে পরিষেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে অযথা হয়রানী বন্ধে অবিলম্বে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ করতে হবে।

৫। বিভাজনের রাজনীতিকে পরাস্ত করে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা কর।

(জ) যৌথ সফরসূচী সফল করার প্রস্তুতি হিসেবে রাজ্যের সর্বত্র ব্লক কমিটিগুলিকে সক্রিয় রাখার জন্য জেলাগতভাবে কর্মসূচী নিতে হবে।

(ঝ) স্থানীয় আদায়যোগ্য দাবি নিয়ে জেলা / সমিতি স্তরের কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

নয়া উদার অর্থনীতির আগ্রাসী ভূমিকা, সাম্প্রদায়িক বিভাজন ও মৌলবাদী তৎপরতার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে। অর্জিত অধিকার রক্ষা, প্রশাসনিক হয়রানি ও আর্থিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে সমস্ত অংশের কর্মচারী সমাজকে সাথে নিয়ে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে যুক্ত হতে হবে।

জীবন-জীবিকার লড়াইয়ে, গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে, দেশের ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষায়, জাত-পাত-ধর্মের বিভেদের রাজনীতির বিরুদ্ধে শত প্রতিকূলতা, সন্ত্রাসকে মোকাবিলা করেছে দেশের গণতন্ত্রপ্রিয় জনগণ। তবে এতে লড়াই স্থগিত করে দিলে হবে না। আগামীতে আরও দূর, আরও বন্ধুর পথ অতিক্রম করতে হবে। পথ কঠিন। কিন্তু লক্ষ্যে পৌঁছানো অসম্ভব নয়। আগামীতে শ্রমিক-কর্মচারী স্বার্থবাহী নিয়োগকর্তা নির্ধারণে সাংগঠনিক কাঠামোকে সচল করে প্রতিটি কর্মচারীকে লড়াইয়ে আবৃত করতে হবে। এই চ্যালেঞ্জ আমাদের গ্রহণ করতেই হবে। □

সংগ্রাম আন্দোলনের মধ্যেই আছে রাজ্য সরকারী কর্মচারী সমাজ

তিলোত্তমার বিচার চেয়ে ১২ই জুলাই কমিটির মিছিল

মৃণাল সেনের জন্মশতবার্ষিকী, পূর্ব বর্ধমান

দমনপীড়নের প্রতিবাদে মিছিল, এগরা, পূর্ব মেদিনীপুর

সংগ্রামী হাতিয়ার পাঠকসভা, বীরভূম

অরণ্য সপ্তাহ প্রতিপালন, হুগলী

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী, মুর্শিদাবাদ

বিক্ষোভ সভা, জলপাইগুড়ি

দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পরে

ধাক্কা খেল স্বৈরাচারের অশ্বমেধের ঘোড়া

জেতেননি, সবক'"টি বিধানসভায় হেরেছে কেন্দ্রের শাসকদল। এই প্রথম, ফৈজাবাদ সংসদে পাঠালো কোনও দলিত প্রার্থীকে।

যে রাজ্যে রাম মন্দির, সেই উত্তরপ্রদেশেই হেরেছেন কেন্দ্রের ছ"-ছ"জন মন্ত্রী। শুধু এই নয় হেরেছেন রাজ্যের দুই মন্ত্রীও। এই নির্বাচনে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করলেও রাজ্যের ১৬ জন মন্ত্রীরাখতে পারেননি তাঁদের বিধানসভা। ডাবল ইঞ্জিন-ই বেলাইনল বারাণসীতে সরকারের প্রধানের গতবারের ব্যবধান পৌনে পাঁচ লাখ থেকে কমে এসে দাঁড়িয়েছে দেড় লাখে। রাজ্যের মোট ৮০ আসনের মধ্য পচাত্তর আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কেন্দ্রের শাসকদল জিততে পেরেছে সাকুল্য ৩৩ আসনে (শরিকরা পেয়েছে মাত্র একটি), বিপরীতে ইন্ডিয়া মঞ্চ জিতেছে ৪৩ আসনে। যেখানে গত লোকসভায় কেন্দ্রের শাসকদল পেয়েছিল ৬২টি আসন, ২০১৪-তে ৭১টি আসন। নির্বচন-পরবর্তী লোকনীতি-সিএসডিএস সমীক্ষায় দেখাচ্ছে, ব্রাহ্মণ, রাজপুত ও বৈশ্য ভোটাররা যেখানে কেন্দ্রের শাসকদলকে ভোট দিয়েছেন, সেখানে ওবিসি, তফসিলি জাতি এবং মুসলিমরা বেছে নিয়েছেন ইন্ডিয় মঞ্চকে।

আসলে বেকারত্ব, কৃষি সংকটে কৃষকদের ক্ষোভ, মূল্যবৃদ্ধি, অগ্নিবীর প্রকল্প নিয়ে তরুণ প্রজন্মের অসন্তোষ তৈরি করেছে পালটা ভাষ্য। 'কাউন্টার ন্যারেটিভ"। এই প্রতি-ভাষ্যই পরাস্ত করেছে হিন্দুত্বের ভাষ্যকে। এটা যে দেশের শাসকদল বোছেনি তা নয়, তাই তারা চেয়েছিল রুজিরুটির সমস্যা থেকে নজর ঘুরিয়ে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়াতে। কিন্তু সাভারকারের দাওয়াই কাজ করেনি এই নির্বাচনে, জিতেছেন আম্বেদকার।

পাঁচবছর আগে ২০১৯ এর লোকসভা নির্বাচনে, হিন্দি বলয়ের (হিন্দি বলয় মানে বিহার, ছাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, দিল্লি ও রাজস্থান) দশ রাজ্যে মোট ২২৫ আসনের মধ্যে কেন্দ্রের শাসকদল একাই জিতেছিল ১৭৭ আসনে। স্ট্রাইক রেট ছিল ৮.৬৬ শতাংশ। এর মধ্যে হরিয়ানার দশটি আসনের সবক'টিতেই জিতেছিল তারা। স্ট্রাইক রেট একেবারে একশ শতাংশ। যেমন জিতেছিল দিল্লির সাতটি, হিমাচলের চারটি এবং উত্তরাখণ্ডের পাঁচটি আসনের সবক"টিতে। রজস্থানে পঁচিশের মধ্যে পেয়েছিল চব্বিশটি আসন, মধ্যপ্রদেশে উনত্রিশের মধ্যে আঠাশ, ছত্তিশগড়ে এগারোর মধ্যে নয়টি, ছাড়খণ্ডে চোদ্দর মধ্যে এগারোট, বিহারে চল্লিশের মধ্যে সতেরোট এবং উত্তরপ্রদেশে আশিটির মধ্যে বাষট্টি'টি আসন।

এবারে, হিন্দি-বলয়ে এনডিএ পেয়েছে সাকুল্যে ১৩০টি আসন, সমর্থনের হার ৪৮.৩ শতাংশ। জোনে ইন্ডিয়া মঞ্চ পেয়েছে ৭২টি আসন, সমর্থনের হার ৪০.১ শতাংশ। অন্যান্যরা ২৩টি আসন, সমর্থনের হার ১১.৬ শতাংশ। যেখানে পাঁচবছর আগে এনডিএ পেয়েছিল ১৯৬টি আসন, সমর্থনের হার ছিল ৫৩.৯ শতাংশ। ইন্ডিয়া মঞ্চ পেয়েছিল সাকুল্যে ১৩টি আসন, সমর্থনের হার ২৯.৭ শতাংশ। অন্যান্যরা ১৬টি আসন, সমর্থনের হার ১৬.৫ শতাংশ। বিজেপি এবারে একা পেয়েছে ১২৭টি আসন। স্ট্রাইক রেট কমে হয়েছে ৫৬.৪৪ শতাংশ। হরিয়ানায় এবারে কেন্দ্রের শাসকদল জিতেছে পাঁচটি আসনে। স্ট্রাইক রেট অর্ধেক কমে হয়েছে ৫০ শতাংশ। রাজস্থানে দশটি আসন কমে হয়েছে চোদ্দটি, বিহারে সতেরো থেকে কমে বারোটি হয়েছে, ছাড়খণ্ডে এগারো থেকে নেমে আট হয়েছে।

দেশের শহরাঞ্চলের (বড় শহর) কেন্দ্রগুলিতে এনডিএ-র ভোট বাড়লেও, কমেছে আধা-শহর (পুরো শহরের চরিত্র নয়), আধা-গ্রাম (পুরো গ্রামের চরিত্র নয়) এবং গ্রামীন কেন্দ্রগুলিতে। দেশের শহরাঞ্চলের (বড় শহর) কেন্দ্রগুলিতে এবারে এনডিএ-র ভোটের ভাগের হার ৫২.৮ শতাংশ, যেধানে পাঁচবছর আগে ছিল ৪৮ শতাংশ। অন্যদিকে আধা-শহর কেন্দ্রগুলিতে তা ৪২.৫ শতাংশ থেকে কমে এবারে হয়েছে ৩৯.৯ শতাংশ। আধা-গ্রাম কেন্দ্রেগুলিতে ৪২ শতাংশ থেকে কমে হয়েছে ৩৭.৩ শতাংশ। আর গ্রামীন কেন্দ্রগুলিতে ৪৪.৯ শতাংশ থেকে কমে হয়েছে ৪৪.১ শতাংশ ইঙ্গিত স্পষ্ট, মফস্বলে জমি হারাচ্ছে হিন্দুত্ববাদ্যের ধ্বজাধারীরা।

৪ জুন ২০২৪, আমরা প্রত্যক্ষ করলাম এক অদ্ভুত পরিস্থিতি। জয়ের পরেও শাসকদল শোকে বিহ্বল, আবার অন্যদিকে পরাজয়ের পরেও মানুষ বিজয় উৎসবে মত্ত। সংখ্যার হিসেবে এনডিএ-র ২৯২, ইন্ডিয়া মঞ্চের ২৩৪-র চেয়ে বড়। তবে কেন পরাজিতরা বিজয় উৎসবে? কারন, স্বৈরতন্ত্রের অশ্বমেধের ঘোড়াকে রুখে দেওয়া গিয়েছে এই ফল মানুষকে ভয়ের পরিবেশ থেকে দিয়েছে মুক্তির আশ্বাস। আজকের ভারতবর্ষের বুকে অপ্রতিরোধ্য উগ্রদক্ষিণপন্থী শক্তিকেও যে হারানো যায়, এই আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে দেশের জনগন।

একথা ঠিক, এই নির্বাচনে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লড়াইটায় দেশের মানুষ বেশ কিছুটা এগিয়েছে। খানিক স্বস্তির পরিবেশ তৈরী হয়েছে দেশের জনগনের সামনে। কিন্তু রয়ে গিয়েছে বিপদ। বিজেপির অশ্বমেধের ঘোড়ায় ধাক্কা দেওয়া গেলেও তাকে লাগাম পরানো যায়নি। হিন্দুত্ববাদ ও কর্পোরেট শক্তির আঁতাত অচিরেই নিজেদের পুনর্সংগঠিত করবে, চেষ্টা করবে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণকে আরও তীব্র করার জন্য। সেই কারণেই ফলাফল ঘোষণার পরদিন থেকেই সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে একের পর এক আক্রমণ শুরু হয়েছ্যে ছত্তিশগড়ের রায়পুর, উত্তরপ্রদেশের আলিগড় এবং গুজরাটের চিখোদরায় হামলায় মোট পাঁচজন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। 'গোহত্যা' বা 'গরুর মাংস উদ্ধারের' অপ্রমাণিত অভিযোগের পরে, মধ্যপ্রদেশের মান্ডলয় ১১ জনের বাড়ি ভেঙে দেওয়া হয়েছিল, হিমাচল প্রদেশের নাহানে একজন সংখ্যালঘু ব্যক্তির দোকান ভাংচুর করা হয়েছিল এবং আরও অনেকের দোকান বলপূর্বক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল এছাড়া উড়িশ্যার বালাসোরে একটা সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটেছে। অন্যদিকে দিল্লির সঙ্গম বিহারে হিন্দুত্ববাদী সদস্যদের দ্বারা একটি গরুর মৃতদেহ উদ্ধার এবং উস্কানিমূলক বক্তৃতা করার পরে সেখানকার বাসিন্দাদের পালিয়ে যেতে বাধ্য করা হয়েছে। জব্বলপুরে, হিন্দুত্ববাদী দলগুলি মুসলমানদের শহর ছেড়ে চলে যাওয়ার ঠকি দিয়ে একটি ভয়ঙ্কর বিক্ষোভের আয়োজন করেছে। অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের পর সাম্প্রদায়িক হামলার এই ধরনের প্রাবল্য এই সত্যকে তুলে ধরে যে হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি নতুন করে প্রতিশোধ নিতে মেরুকরণের প্রচেষ্টাকে তীব্রতর করছে।

সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে এফআইআর, সিবিআই দ্বারা অরবিন্দ কেজরিওয়ালের পুনরায় গ্রেফতার, অরুন্ধতী রায়ের বিরুদ্ধে মামলা ও তদন্ত শুরুর অনুমোদন ইত্যাদি অবিরাম অব্যাহত রয়েছে। এনএসও এবং প্রধানমন্ত্রীর প্রিন্সিপ্যাল সেক্রেটারিকে পুনঃনিযুক্ত করা, গত মন্ত্রিসভার প্রায় সব প্রাক্তন মন্ত্রীদের একই পদে নতুন মন্ত্রিসভায় পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করা এবং লোকসভার স্পিকার হিসাবে ওম বিড়লাকে পুনর্নির্বাচিত করা যিনি প্রায় ১৫০ জন সাংসদকে বহিষ্কার করেছিলেন, এইসবের মাধ্যমে একটা বিষয় স্পষ্ট যে বর্তমান সরকারেও একই ভাবে মোদির অধীন কাজকর্ম চলবে।

একই সাথে পুঁজিবাদ পালন করবে তার ভূমিকা নেবে শ্রমিক-বিরোধী, কৃষক-বিরোধী, দেশ-বিরোধী পদক্ষেপ। যেমন টেক-গুরু চন্দ্রেবাবু আসতেই শেয়ার বাজার ফিরেছে নিজের ছন্দে। শেয়ার বাজার মানে লগ্নী পুঁজির প্রত্যাশার স্কুক। সেকারণে কোনও মেহ নয় জারি রখতে হবে লড়াই। ভোট পণ্ডিতদের চেয়ে অনেক বেশি স্মার্ট আন্তর্জাতিক লগ্নী পুঁজি। দুর্বল বিজেপি এবং নীতিশ-নাইডুর সমর্থনে এনডিএ"র প্রতি লগ্নী পুজি হবে আরও আগ্রাসী। ভারতীয় সংস্থার সিইও-রা যেমন চেয়েছে। নতুন সরকার জারি রাখুক তার অর্থনৈতিক সংস্কার, যে নীতি নিয়ে চলছে, থাকুক তার ধারাবাহিকতা। এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে ভারতের শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলন। পুঁজির আধিপত্যের মোকাবিলায় আরও প্রত্যয় নিয়ে চালিয়ে যেতে হবে জঙ্গী সংগ্রাম।

দেশের বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি স্বৈরতান্ত্রিক, ফ্যাসীবাদী প্রবণতার উগ্রদক্ষিণপন্থী সাম্প্রদায়িক শাসনের বিরুদ্ধে দেশের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক শক্তিকে সর্বোচ্চরূপে সমবেত করতে, শ্রমজীবী জনগণকে সংগঠিত করতে ভূমিকা পালন করেছিল এবং একইসাথে ইন্ডিয়া ব্লককে শক্তিশালী করতে অবদান রেখেছিল তবে বামপন্থীদলগুলির ফলাফল নেতিবাচক। বাম রাজনৈতিক দলগুলি সামগ্রিকভাবে৮ জন সাংসদ নির্বাচিত হয়েছে, যা দেশের রাজনৈতিক ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণের জন্য যথেষ্ট নয়। ভবিষ্যতের দিনগুলিতে শক্তিশালী বামপন্থ সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে হিন্দুত্বকর্পোরেট আঁতাতের বিরুদ্ধে- সংগ্রামকে তীব্র করার জন্য এটা জরুরি। এই পরিস্থিতিতে, ভারতীয় সংবিধান, ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো এবং জনগণের নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামের সাথে সাথে ভারতীয় জনগণের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠের জন্য উন্নত জীবন-জীবিকা অর্জনের সংগ্রামকে আরও তীব্র করতে হছে এই সংগ্রাম শক্তিশালী করা যেমন সংসদের ভিতরে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির দায়িত্ব তেমনি সংসদের বাইরে শ্রমিক-কৃষক-কর্মচারীসহ দেশের আপামর খেটে খাওয়া মানুষের সামনে লড়াইকে তীব্র করার দায়িত্ব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। □

সুমন কান্তি নাগ

জন্ম শতবর্ষে কমরেড শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য

সুমিত ভট্টাচার্য

এই বছরটি স্বাধীনতা উত্তরপর্বে রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা সংগঠক কমরেড শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্যর জন্ম শতবর্ষ। তিনি যাঁদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, বহু প্রতিকূলতাকে মোকাবিলা করে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি নামক যৌথ আন্দোলনের মঞ্চটিকে গড়ে তুলেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম শীর্ষ স্থানীয় নেতৃত্ব কমরেড অরবিন্দ ঘোষেরও জন্মশতবর্ষ এই বছরটিই। শতবর্ষে পদার্পণকারী এই দুই বরণীয় নেতৃত্বের জন্ম একই বছরে। তৎকালীন পূর্ববঙ্গ অধুনা বাংলাদেশে। দীর্ঘ চার দশক একই সাথে পথ চলেছেন। আবার একই বছরে (১৯৮৪) উভয়েরই জীবনাবসান ঘটে। সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের গণ্ডীর বাইরেও ওই দুই নেতার ব্যক্তিগত সখ্যতা, পারিবারিক যোগাযোগ ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। যা এই নিবন্ধকারের কিছুটা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হয়েছিল। তবে একথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে কমরেড অরবিন্দ ঘোষের কর্মপরিধি ছিল বৃহত্তর। কারণ তিনি শুধু রাজ্য কর্মচারী আন্দোলনের গঠন পর্যায়ের নেতা ছিলেন না। তিনি ছিলেন রাজ্য কর্মচারী আন্দোলনের সর্বভারতীয় সংগঠনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং পশ্চিমবাংলার শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের যুক্ত আন্দোলন মঞ্চ (১২ই জুলাই কমিটি) গড়ে তোলার অন্যতম কারিগর।

কমরেড শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য ১৯২৪ সালের ১৮ নভেম্বর তৎকালীন পূর্ববঙ্গের বরিশাল জেলার বাইসারি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এই বাইসারি গ্রামেই ছিল কবি জীবনানন্দ দাসের মাতুলালয়। শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্যর পিতা ভুবনমোহন ভট্টাচার্য ছিলেন পুরোহিত। বাইসারি সহ সংলগ্ন বিভিন্ন গ্রামে পুরোহিত হিসেবে পুজো-পার্বন ও সামাজিক অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করে সংসার প্রতিপালন করতেন। শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্যর যখন মাত্র আড়াই বছর বয়স, সেই সময়ে তাঁর মাতৃবিয়োগ হয়।

ভুবনমোহন ভট্টাচার্যর প্রথম স্ত্রী মারা যাওয়ার পর দ্বিতীয়বার বিবহা করেন। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম ছিল প্রভাসিনী দেবী। তিনিই কমরেড শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্যকে মাতৃস্নেহে লালন-পালন করেন।

কমরেড শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্যর যখন মাত্র ১১ বছর বয়স, সেই সময়ে তাঁর পিতা পরিবার সহ বরিশাল থেকে কলকাতায় চলে আসেন (অর্থাৎ দেশ ভাগের অনেক আগেই)। কলকাতায় এসে ভবানীপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ভ্রাতৃদ্বয় প্রয়াত ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী ও অনিল গাঙ্গুলীর মালিকানাধীন একটি বাড়িতে ভাড়াটিয়া হিসেবে বসবাস শুরু করেন। কলকাতাতেও তাঁর পিতা পুরোহিতগিরিকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। এটিই ছিল যৌথ পরিবারের একমাত্র ভরণ-পোষণের মাধ্যম। স্বভাবতই দারিদ্র্যের মধ্যে শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্যর শৈশব ও কৈশোর অতিবাহিত হয়েছে। কলকাতায় বসবাস শুরু করার পরে কমরেড শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য সাউথ সুবার্বান (ব্রাঞ্চ) স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হন। সেখান থেকেই ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে আশুতোষ কলেজে কলা বিভাগে ইন্টারমিডিয়েট কোর্সে (আই.এ) ভর্তি হন। ইন্টারমিডিয়েট উত্তীর্ণ হয়ে আশুতোষ কলেজ থেকেই স্নাতক হন। কমরেড শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্যের কলেজ জীবন ছিল পশ্চিমবাংলায় উত্তাল চল্লিশের দশকের সময়কালে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর দেশপ্রেম, দেশের স্বাধীনতার লক্ষ্যে আজাদ হিন্দ্ বাহিনী গড়ে তোলা আরও বহু যুবকের মতোই কমরেড শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্যকে আকৃষ্ট করেছিল। মানসিকভাবে তিনি সম্পূর্ণতই হয়ে উঠেছিলেন নেতাজীর অনুগামী। বন্ধু-বান্ধবের আড্ডায় গান্ধী-নেতাজি বিতর্কে (সেই সময় বাঙালীর অন্যতম বিতর্কের বিষয়) তিনি নেতাজির পক্ষই অবলম্বন করতেন। এই সময় তিনি নিয়মিত ব্যায়াম চর্চাও করতেন।

১৯৪৫ সালে কলকাতা হাইকোর্টে করণিক পদে যোগদান করেন এবং শুরু থেকেই তৎকালীন হাইকোর্ট এ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হন। তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে ছিলেন অ্যান্টনি কবিয়াল খ্যাত গায়ক সবিতাব্রত দত্ত এবং নির্মল কুমার মুখোপাথ্যায়, যিনি পরবর্তীকালে বাংলা চলচ্চিত্রে অভিনেতা হিসেবে সুপরিচিতি লাভ করেছিনে।

১৯৪৭ সালে দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, উদ্বাস্তু মানুষের স্রোত কমরেড শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্যর মননকেও আন্দোলিত করেছিল। বিশেষত, তাঁর পরিবার দেশভাগের বহু আগেই কলকাতায় চলে এলেও, অন্যান্য আত্মীয়স্বজন দেশভাগের ফলে এপার বাংলায় এসে বিভিন্ন উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয় নেন। তাঁদের মধ্যে অনেককেই শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্যর পিতা উদ্বাস্তু শিবির থেকে ভবানীপুরের বাসায় নিয়ে আসেন। যৌথ পরিবারের কলেবর বৃদ্ধি পায়। পরিবারে উপার্জনশীল সদস্য তখন তিন জন। তাঁর পিতা, তাঁর বড় ভাই, যিনি পুরোহিতগিরিকেই পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন এবং তাঁর হাইকোর্টের নিম্নবর্গীয় করণিক পদের চাকরি।

১৯৪৮ সালে রাজ্যব্যাপী সরকারী কর্মচারীদের যৌথ আন্দোলন গড়ে তোলার প্রাথমিক উদ্যোগ শুরু হয়। তৎকালীন ডব্লু বি এম ও-র নেতৃবৃন্দ এই উদ্যোগ গ্রহণ করেন। যৌথভাবে পথ চলার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে মহাকরণ ক্যান্টিন হলে এক সভার আয়োজন করা হয় এবং হাইকোর্ট এ্যাসোসিয়েশনকেও সেই সভায় উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। কমরেড শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য তখন ঐ সংগঠনের কার্যকরী কমিটির সদস্য। যৌথ আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে আহূত সভায় হাইকোর্ট এ্যাসোসিয়েশন অংশগ্রহণ করবে কি না, সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য হাইকোর্ট ভবনের ৮নং কোর্ট রুমে একটি সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়। সেই সময়ে হাইকোর্ট এ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন সুধাংশু বসু। তিনি পদাধিকারীদের পক্ষ থেকে যৌথ আন্দোলনের লক্ষ্যে আহূত সভায় না যাওয়ার পক্ষে প্রস্তাব উত্থাপন করে, কিন্তু সভায় উপস্থিত অধিকাংশ সদস্য যৌথ আন্দোলনে যাওয়ার পক্ষে মত দেয়। এই পাল্টা প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছিলেন শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য। ভোটাভুটিতে সম্পূর্ণভাবে হেরে গিয়ে সুধাংশু বসু সহ সমস্ত পদাধিকারী পদত্যাগ করেন। সংগঠনের হাল ধরেন কমরেড শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য এবং হাইকোর্ট এ্যাসোসিয়েশন যৌথ আন্দোলন গড়ে তোলার প্রক্রিয়ায় শরিক হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য হাইকোর্ট এ্যাসোসিয়েশনও (বর্তমানে হাইকোর্ট এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশন) এই বছর শতবর্ষে পদার্পণ করল (স্থাপিত ১৯২৫) এবং সারা দেশে কলকাতা হাইকোর্টই একমাত্র হাইকোর্ট, যেখানকার কর্মচারীরা রাজ্য কর্মচারী আন্দোলনের মূল স্রোতের শরিক। দেশের দ্বিতীয় কোনো হাইকোর্টের কর্মচারী সংশ্লিষ্ট রাজ্যের কর্মচারী আন্দোলনের মূল স্রোতে যুক্ত নেই। এই ব্যতিক্রমী দৃস্টান্ত স্থাপনে কমরেড শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্যর ভূমিকা অনস্বীকার্য। যদিও তাঁর এই রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচয় অনেকটাই আলোচিত হয়ে থেকে গেছে।

যৌথ আন্দোলনকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করতে উদ্যোগী হয় রাজ্য সরকার। যৌথ আন্দোলন নিষিদ্ধ করে কালা সার্কুলার জারি করা হয়। সরকারী নিষেধাজ্ঞার কারণে যৌথ আন্দোলন গড়ে তোলার প্রক্রিয়া ধাক্কা খেলেও, ৯টি সংগঠন আলোচনা করে একটি কৌশল অবলম্বন করে। তাহল, যৌথভাবে সরকারের কাছে কোনো দাবিসনদ পেশ না করে, প্রতিটি সংগঠন একই বক্তব্য নিজ নিজ লেটার হেডে সরকারের কাছে পেশ করতে থাকবে। দাঁড়ি, কমা সহ হুবহু একই বক্তব্য পৃথক পৃথক লেটার হেডে দেওয়ার ফলে আইনত সরকারের কিছু করার ছিল না। কারণ সরকারই ক্যাডার ও দপ্তর ভিত্তিক সংগঠন করার ও দাবি পেশের অনুমতি দিয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ যৌথ আন্দোলন গড়ে তোলার প্রক্রিয়ায় শুরুতে ২০টি সংগঠন শামিল হলেও, কালা সার্কুলারের ধাক্কায় ১১টি সংগঠন সরে যায়। ৯টি সংগঠনের মধ্যে অন্যতম ছিল হাইকোর্ট এ্যাসোসিয়েশন এবং যাকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য।

১৯৫৪ সালে বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা জ্যোতি বসুর মধ্যস্থতায় মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধানচন্দ্র রায় কর্মচারী সংগঠনের প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাৎ করতে সম্মত হন। সেই প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য।

১৯৫৬ সালে ৮ সেপ্টেম্বর ২৫ টাকা বিশেষ ভাতা, কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা প্রভৃতি দাবিসম্বলিত স্মারকলিপি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পেশ করার জন্য ওয়েলিংটন স্কোয়ারে জমায়েত করে একটি মিছিল তাঁর বাসভবন অভিমুখে এগোতে থাকে। পুলিশ মিছিলের পথ আটকালে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে প্রায় বিশ হাজার কর্মচারীর উপস্থিতিতে সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় সভাপতিত্ব করার জন্য সেক্রেটারিয়েট এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশনের নেতা পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়কে বরখাস্ত করা হয়েছিল। ঐ বিক্ষোভ সভা থেকেই যৌথ মঞ্চ গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। প্রথমে নাম দেওয়া হয়েছিল কেন্দ্রীয় কো-অর্ডিনেশন কমিটি। পরবর্তীতে নাম হয় রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। প্রথম প্রস্তুতি কমিটির যুগ্ম-আহ্বায়ক নির্বাচিত হন শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য ও সন্তোষ ওয়াদ্দেদার (ডব্লু বি এম ও এ)। সন্তোষ ওয়াদ্দেদার ছিলেন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের ভাই। ১৯৬২ সালে কলকাতার ত্যাগরাজ হলে অনুষ্ঠিত প্রথম সম্মেলনে কমরেড অরবিন্দ ঘোষ সম্পাদক ও শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য যুগ্ম-সম্মাদক নির্বাচিত হন। ১৯৬৪ সালে দ্বিতীয় সম্মেলনে তিনি সভাপতি নির্বাচিত হন এবং আমৃত্যু ঐ পদে ছিলেন। ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থা ঘোষণার পরে তাঁকে MISA আইনে (Maintenance of Security Act.) গ্রেপ্তার করা হয় এবং চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। ১৯৭১ সালের সংবিধানের ৩১১/২(গ) ধারায় তাঁকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করার জন্য রাজ্যপালের চিঠি প্রধান বিচারপতির কাছে পোঁছেছিল। কিন্তু সেই সময় কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি অনুমোদন দেননি। ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থার সময়ে প্রধান বিচারপতির অনুমোদন ছাড়াই তাঁকে বরখাস্ত করা হয়। হাইকোর্টের কর্মচারীকে রাজ্যপাল বরখাস্ত করতে পারেন কি না, এই সাংবিধানিক এক্তিয়ারের প্রশ্ন তুলে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করা হয়। শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্যর পক্ষে সওয়াল করেন সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় ও নরনারায়ণ গুপ্ত। মামলায় জিতে তিনি এক বছর পরে পুনর্বহাল হন। গ্রেপ্তার করার পরে তাঁকে ৪ মাস প্রেসিডেন্সী জেলে রাখা হয়েছিল।

শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য নিয়মিত ব্যায়াম চর্চার কারণে যেমন বলশালী ছিলেন, তেমনই ছিলেন অসীম সাহসী। একবার তিনি এবং অজয় মুখোপাধ্যায় জেলা সফর সেরে ট্রেনে করে কলকাতায় ফিরছিলেন। ট্রেনের কামরার মধ্যেই একদল কংশাল (সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের বাহিনী) দুষ্কৃতি তাঁদের ওপর চড়াও হয়। শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য তাঁর সাথে থাকা ছাতা দিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। আহত-রক্তাক্ত হয়েও শেষপর্যন্ত ঐ দুষ্কৃতিদের ট্রেন থেকে নেমে যেতে বাধ্য করেন।

কমরেড শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য ছিলেন মিতবাক, কিন্তু স্পষ্টভাষী এবং খাদ্যরসিক। ছাত্র জীবনে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর অনুগামী ধীরে ধীরে বামপন্থাকে তাঁর জীবনের ধ্রুবতারা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। সেই বিশ্বাসে ভর করেই রাজ্য কর্মচারী আন্দোলন এবং কলকাতা হাইকোর্টের কর্মচারীদের জীবনের শেষদিন পর্যন্ত নেতৃত্ব দিয়েছেন। □

কোন পথে ব্রিটেন ?

উৎসর্গ মিত্র

আমাদের এখানে যেমন দেশের সংসদীয় নির্বাচন ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর, ব্রিটেনে ব্যাপারটা তেমন নয়। সেখানে নির্বাচন ঘোষণা করেন সেখানকার রাজা, অবশ্যই সেখানকার প্রধানমন্ত্রীর 'অনুরোধ'ক্রমে এবং তার পরে সেই নির্বাচন কার্য্য পরিচালনা করে সেখানকার নির্বাচন কমিশন। এখানে বলার ব্যাপার হল এই যে, সে দেশের অন্যান্য নির্বাচন একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর হলেও একমাত্র পার্লামেন্ট নির্বাচন যদি চলতি প্রধানমন্ত্রী মনে করেন, তাহলে পাঁচ বছর মেয়াদকালের মধ্যে যে কোনও সময়েই সংঘটিত হতে পারে। নির্বাচনের দিন ঠিক করেন প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং এবং সাধারণতঃ সেটি কোনও এক বৃহস্পতিবার হয়। যদিও ব্রিটেনের সংবিধান অন্যান্য দেশের মতো 'লিখিত' নয়, তবুও সে দেশের প্রশাসক এবং প্রজা---উভয়ই সেখানকার রীতি-নীতি মেনে চলতেই অভ্যস্থ। ব্রিটেনের এবারের ভোটের বেলাতেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনকের 'অনুরোধে' রাজা তৃতীয় চার্লস ঘোষণা করেন নির্বাচনের এবং সেই মোতাবেক ব্রিটেনবাসী গত ৪ জুলাই তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন দেশের সংসদের নিম্নকক্ষ অর্থাৎ 'হাউস অফ কমন্স'এর ৬৫০টি আসনে প্রতিনিধি বেছে নিতে।

ব্রিটেনে আমাদের দেশের মতো সরাসরি হাজির হয়ে যেমন ভোট দেওয়া যায়, আবার সরাসরি ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত থাকতে না পারলে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমেও যে কোনও নাগরিক ভোট দিতে পারেন (আমাদের দেশে এই ব্যবস্থা শুধুমাত্র ভোট কর্মী ও বয়স্ক, অপারগ নাগরিকদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য)। এমনকি যদি কেউ মনে করেন যে দেশের বাইরে থাকার জন্যে বা অন্য কোনও কারণে কোনোমতেই ভোট কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিতে পারবেন না, তাহলে ইচ্ছে করলে তিনি তাঁর নির্বাচন ক্ষেত্রে বসবাসকারী যে কোনও নাগরিককে তাঁর প্রতিনিধি করে তাঁর মাধ্যমেও ভোট দিতে পারেন (Proxy Vote-এর ব্যবস্থা আমাদের দেশে নেই)। প্রতিটি ক্ষেত্রেই নির্বাচন কমিশনের অফিসে গিয়ে বা অনলাইনে তাঁরা আবেদন করে প্রয়োজনীয় অনুমোদন পেয়ে যেতে পারেন।

এতো কিছুর পরেও এবারে ব্রিটেনবাসীর মধ্যে ভোটদানের উৎসাহ দেখা গেছে বড়োই কম। সে দেশের ইন্সটিটিউট ফর পাব্লিক পলিসি রিসার্চ (IPPR) জানাচ্ছে, ভোট পড়েছে মাত্র ৫২ শতাংশ। ১৯২৮ সালে দেশের ২১ বছর বয়সী (এখন ১৮ বছর) সব ধরণের নাগরিকদের জন্যে ভোটাধিকার উন্মুক্ত করে দেওয়ার পরে যত নির্বাচন হয়েছে, সেগুলির মধ্যে এবারেই ভোটের হার সর্বনিম্ন। অর্থাৎ দেশের আগামী প্রশাসক নির্বাচনে দেশের প্রায় অর্ধাংশের মতামত অজানাই থেকে গিয়েছে এবারের নির্বাচনে, যা গণতন্ত্রের পক্ষে এক বিপজ্জনক ইঙ্গিত বলে মনে করছেন সে দেশের বিশেষজ্ঞ মহল।

পরদিন, অর্থাৎ ৫ জুলাই ভোটের ফল ঘোষণার পর দেখা গেল যে গতবারের ভোটে নিরঙ্কুশ সংখ্যাধিক্য লাভকারী ঋষি সুনকের দল 'কনজারভেটিভ পার্টি' এবারে একেবারে পর্যুদস্ত হয়ে গেছে, অন্য দিকে গত ১৪ বছর ক্ষমতার অলিন্দের বাইরে অবস্থানকারী 'লেবার পার্টি' হয়ে গেছে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী। মজার কথা হলো, প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৩৫ সালের পর থেকে গত নির্বাচনে সংখ্যার নিরিখে এই 'লেবার পার্টি'র ফল হয়েছিল সব চাইতে খারাপ। চমকে দেওয়ার মতো তথ্য এটি।

আসন সংখ্যা বিচার করতে গেলে এবারে 'লেবার পার্টি' পেয়েছে ৪১২টি আসন, গত বারের থেকে ২১০টি আসন বেশি। অন্য দিকে 'কনজারভেটিভ পার্টি' পেয়েছে ১২১টি আসন, গতবারের থেকে ২৪৪টি আসন কম। এছাড়া লিবেরাল ডেমোক্রাটরা পেয়েছে ৭২টি আসন, গতবারের থেকে ৬১ বেশি, অন্যান্যদের মধ্যে বাকিটা। দেশের আগামী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে 'লেবার পার্টি'র নেতা কিয়ের স্টার্মার শপথ নিয়েছেন গত ৯ জুলাই এবং দেশের পার্লামেন্ট তার কাজ শুরু করে দিয়েছে গত ১৭ জুলাই থেকে।

এখন প্রশ্ন হল সেখানে এমন ওলট পালট ফলাফল হলো কেন? এর উত্তরও আছে বিশেষজ্ঞদের কাছে। তাঁরা বলছেন, গত কয়েক বছরে সেখানকার করের হার এত বেশি বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়েও ছিল না। মূল্য বৃদ্ধির আবহাওয়ায় এই কর ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ চরমে উঠে গিয়েছিল। দেশের অর্থনীতির বেহাল অবস্থা সামাল দিতে সুনক ঋণের পরিমাণ এতোটাই বাড়িয়ে ফেলেছিলেন যে, তা হয়ে উঠেছিল ব্রিটেনের বার্ষিক উৎপাদনের মূল্যের সমান (annual economic output)। ফলে দেশের নাগরিকদের জীবন ধারণের মান একেবারে তলানিতে এসে ঠেকেছিল। পরিষেবার কাজ প্রায় বন্ধের মুখে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সেখানকার সুবিখ্যাত স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্র। অব্যবস্থা এবং সেখানকার কর্মীদের উপর প্রশাসনিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বাধ্য হয়ে ধারাবাহিক ধর্মঘটে যাওয়ার ফলে সে পরিষেবা প্রায় মুখ থুবড়ে পড়েছিল।

এ সবের ফলে ব্রিটেনবাসী সুনককে 'অযোগ্য' হিসেবেই চিহ্নিত করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। সুনক নিজেও বুঝতে পারছিলেন সে কথা। তবুও অনেকটা জুয়া খেলার মতো করেই আগামী জানুয়ারি, ২০২৫-এর পরিবর্তে এই জুলাই মাসেই এগিয়ে নিয়ে এসেছিলেন দেশের নির্বাচন। দেশের মানুষ তাঁকে সরিয়ে দিতে কাল বিলম্ব করেননি। শুধু 'সরিয়ে দিয়েছেন' বললে সবটা বলা হয় না। আসলে তাঁরা সুনককে তাঁর অযোগ্যতার সমুচিত 'জবাব' দিয়েছেন। সুনক নিজে কোনও রকমে জিতলেও পরাজিত হয়েছেন তাঁর মন্ত্রী সভার একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী। এমনিতেই ব্রেক্সিটের পর গোষ্ঠী দ্বন্দ্বে দীর্ণ 'কনজারভেটিভ পার্টি'র একাধিক নেতা গত আট বছরে দল ছেড়ে বসে গিয়েছিলেন। এবার দেশের জনগণও তাঁর পাশ থেকে সরে দাঁড়ালো। স্বভাবতই সুনকের আর বলার কোনও মুখ ছিল না সাংবাদিকদের কাছে। রাজার কাছে পদত্যাগ পত্র জমা দিতে যাওয়ার আগে তিনি তাই শুধু বলেছেন "Sorry!"

নামে 'লেবার পার্টি' হলেও দলটি মোটেও সাম্যবাদ বা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী কোনও শ্রমিক শ্রেণির পার্টি নয়, বরং এ এক 'মধ্য-দক্ষিণ' পার্টি। হিসেব মতো কনজারভেটিভ পার্টির থেকে খুব বেশি আলাদা হওয়ার কথা নয় এই দলের আর্থিক বা প্রশাসনিক নীতি। তবু দেশের মানুষ যখন দু হাত ভরে ভোট দিয়েছেন এই দলটিকেই, তখন দেখা যাক আগামী পাঁচ বছর তারা দেশকে কোন পথে নিয়ে যায়। এ কারণেই সে দেশের মানুষকে সতর্ক থাকতে আহ্বান জানিয়েছে সেখানকার কমিউনিস্ট পার্টি সিপিজিবি—কমিউনিস্ট পার্টি অফ গ্রেট ব্রিটেন। □

তিলোত্তমার রক্তে রক্তাক্ত হল বাংলার মাটি

৯ আগস্ট '২৪ রাতের অন্ধকারে তিলোত্তমার রক্তে রক্তাক্ত হল বাংলার মাটি। তখনও নিদ্রায় মগ্ন সমস্ত বাংলা। আর জি কর হাসপাতালে একটানা ৩৬ ঘণ্টা ডিউটি করার পরে চেস্ট বিভাগের স্নাতোকত্তর ছাত্রী, মহিলা ইনটার্ণ চিকিৎসক তখন তাঁর ক্লান্তি নিরসনে বিশ্রাম নিতে গেলেন হাসপাতালের এক নির্দিষ্ট আশ্রয়ে। শেষবারের জন্য ফোনে কথা হল মায়ের সাথে। এই সময়ে তখনও সে বোঝেনি এটাই তার জীবনের শেষ রাত। পরের দিন সকাল ৯ টায় হাসপাতালের সেমিনার হলে রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় আবিষ্কৃত হল তার নিথর দেহ। যে হাসপাতাল ছিল তার দ্বিতীয় ঘর, সেই হাসপাতালই তার নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করা দূরের কথা, নিরাপত্তাকে নিশ্চিহ্ন করে প্রাণটাকেই কেড়ে নিল। সব থেকে বড় কথা হল, হাসপাতালের প্রশাসনের তরফে এই ঘটনাকে পেশাদারী দ্রুততায় আত্মহত্যা বলে চিহ্নিত করে ছাত্রীর পরিবারকে খবর দেয়া হয়। হাসপাতালের সুপার 'তদন্ত চলছে' বলে দায়সারা বিবৃতি দিলেও, সন্ধ্যা পর্যন্ত যতক্ষণ না রাজ্য মহিলা কমিশন স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে মামলা দায়ের করেছে, ততক্ষণ হাসপাতাল প্রশাসনের পক্ষ থেকে ছাত্রীর এই অস্বাভাবিক মৃত্যুকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে এক অস্বাভাবিক তৎপরতা। আর জি কর হাসপাতালের ডাক্তার, নার্সিং কর্মচারীসহ অন্যান্য কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রীদের প্রবল সম্মিলিত প্রতিবাদের মুখে দাঁড়িয়ে ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হতেই ছাত্রীর মরদেহ তার পরিবারের হাতে না দিয়েই তাকে দাহ করার জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠে পুলিশ প্রশাসন।

সেটা ছিল এক অদ্ভুত সময়। ৮ আগস্ট প্রয়াত হয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, ৯ আগস্ট তার শেষ যাত্রায় সামিল হয়েছিল রাজ্যের শোকসন্তপ্ত মানুষ। একটা শোকের ধাক্কা সামলে ওঠার আগেই রাজ্যের মানুষ শুনতে পেল হাসপাতালের মধ্যেই কর্মরত অবস্থাতেই মৃত্যু ঘটেছে তিলোত্তমার শুধু তাই নয়, ময়নাতদন্তে উঠে আসলো আরও এক ভয়ানক কাহিনী, মৃত্যুর আগেই তাকে সহ্য করতে হয়েছে চরমতম শারীরিক লাঞ্ছনা, ধর্ষিতা হয়েছেন তিনি। চমকে উঠেছে রাজ্যের মানুষ। যে হাসপাতালে একজন মুমূর্ষু মানুষ চিকিৎসার জন্য যায়, আস্থা নিয়ে নিজেদের ভালোমন্দ সবটাই ছেড়ে দেন এই চিকিৎসকদের হাতে, সেই চিকিৎসকই যখন হাসপাতালে এই পাশবিক অত্যাচারের শিকার হন তখন কে দেবেন তাদের নিরাপত্তা?

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির আহ্বানে মিছিল

তিলোত্তমা ছিলেন রাজ্যের নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের এক কাহিনী। বাবা-মায়ের একমাত্র মেধাবী সন্তান, তাদের চোখের স্বপ্ন। শুধু আজকের প্রতিযোগিতার বাজারের লড়াই নয়, ছিল নিম্ন আয়ের পরিবারের এক প্রবল অর্থনৈতিক লড়াই। এই লড়াইয়ে জয়ী হতেই সে পৌঁছে গিয়েছিল চিকিৎসা বিজ্ঞানের স্নাতকোত্তর শিক্ষার শেষ প্রান্তে। এই কাহিনী তো রাজ্যের আপামর মানুষের স্বপ্ন। সেই স্বপ্নের হত্যা ঘটেছে ঐ রাতে। পৈশাচিক জঘন্য লালসার শিকার হতে হয়েছে তাকে। শুধু তাই নয়, যাদের উপর আস্থা রেখে তার বাবা-মা ছেড়ে দিয়েছিলেন নিজেদের চোখের মণিকে, সেই হাসপাতাল তাকে শুধু নিরাপত্তা দিতে পারেনি। মর্মান্তিক এই ঘটনাকে আত্মহত্যা বলে চিহ্নিত করছে সেই চরম মুহূর্তে। তাই এই ঘটনার জন্য প্রকৃত দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিসহ 'জাস্টিস'-এর দাবিতে কার্যত ফুঁসে উঠেছে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ। স্বতঃস্ফূর্ততার উদগীরণ ঘটেছে ১৪ আগস্টের রাতে সমগ্র রাজ্য জুড়ে। "WE WANT JUSTICE, JUSTICE FOR RG KAR" এই স্লোগানে কেঁপেছে এই বাংলা থেকে শুরু করে, বাংলার বাইরে সমগ্র দেশ ও দেশের বাইরের এক বিশাল অংশের মানুষ। এই প্রতিবাদ শুধু তিলোত্তমার ধর্ষণ ও হত্যার বিরুদ্ধে নয়। এই প্রতিবাদ এই সমাজের অভ্যন্তরের সমস্ত ধরণের সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতার বিরুদ্ধে। এই প্রতিবাদ আর জি কর হাসপাতালের প্রিন্সিপাল ডাঃ সন্দীপ ঘোষের মন্তব্য 'রাতের বেলায় একা একা সেমিনার হলে গিয়ে মেয়েটি দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজ করেছে' এই মানসিকতার বিরুদ্ধে --- যে মানসিকতা নারীদের এই পৃথিবীতে ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে আটকে রাখতে চায়, যে মানসিকতা নারীদের অর্থনৈতিক স্বাধিকারের বিরুদ্ধে কাজ করে, যে মানসিকতা নারীদের নিজের মতো করে জীবন যাপনের অধিকারকে কেড়ে নিতে চায়, যে মানসিকতা নারীকে শুধুমাত্র পুরুষের ভোগের বস্তু হিসাবে দেখতে চায়, সেই মানসিকতার বিরুদ্ধে। তাই তো ৮ থেকে ৮০ সব নারীরাই নেমেছে আজ রাস্তায় প্রতিবাদে। কিন্তু হতভাগ্য এই বাংলা, এই রাজ্যের প্রশাসনের প্রধান একজন নারী হয়েও রাজ্যের নারীরা ধর্ষিতা-লাঞ্ছিতা হচ্ছেন প্রতিদিন শুধু নয়, প্রধানার রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খার কারণে এই দোষীরা পাচ্ছেন রাজনৈতিক-প্রশাসনিক আশ্রয়। যে পুলিশ তিলোত্তমার নিরাপত্তা দিতে পারেনা, যে পুলিশ ক্রাইম সাইটকে সুরক্ষিত রাখতে পারেনা দুষ্কৃতীদের হাত থেকে, সেই পুলিশ আজ প্রতিদিন লাঠি ধরছে প্রতিটি প্রতিবাদকারীদের বিরুদ্ধে। তাই আজকের প্রতিবাদ স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সঙ্গে তুলনীয় ঐতিহ্যবাহী কলকাতা পুলিশ, হাসপাতালের চিকিৎসক, আধিকারিকদের পাশাপাশি, হাসপাতালের মধ্যে দুষ্কৃতি বাহিনীদের দ্বারা গোটা ইমারজেন্সী ওয়ার্ডে হামলা রুখে দেওয়ার অপদার্থতার বিরুদ্ধে, যাদের প্রশ্রয়ে হাসপাতালের সর্বত্র দুর্নীতির আখড়া হয়ে উঠেছে তাদের উপযুক্ত শাস্তির দাবিতে। এমনকি এই রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা কার্যত ভেঙে পড়ার জন্য প্রকৃত দায়ী সেই মেরুদণ্ডহীণ রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধেও।

নার্সিং কর্মচারীদের মিছিল

তাই আজকে আমরা, রাজ্যের কর্মচারী সমাজ ও সমাজের সকল প্রতিবাদীদের সাথে রাস্তার প্রতিবাদে রয়েছি, নিজেদের অর্থনৈতিক অধিকারগত লড়াইকে কিছুদিনের জন্য হলেও পাশে সরিয়ে রেখে, আমরা আজ তিলোত্তমার বিচারের দাবিতে সরব হয়েছি। ১২ আগস্টে আর জি কর হাসপাতালের সামনে প্রতিবাদ সভা, ১৩ আগস্ট রাজ্যের সর্বত্র দপ্তরগুলিতে প্রতিবাদ, ১৬ আগস্টের রাজ্য জুড়ে ধিক্কার সভা, ২০ আগস্ট ১২ জুলাই কমিটি আহুত বিক্ষোভ মিছিল একের পর এক প্রতিবাদের ঢেউয়ে সামিল হচ্ছেন রাজ্যের আপামর কর্মচারী সমাজ। □

পেনশনার্স সমিতির উদ্যোগে মিছিল

(ঘটনার পরবর্তীতে প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার ভিত্তিতে এই লেখাটি তৈরি করা হয়েছে)

সুমন কান্তি নাগ

১২ই জুলাই কমিটির প্রতিষ্ঠা দিবস

"ন্যায্য দাবী আদায়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনই পথ, এই যৌথ আন্দোলনের মঞ্চকে আরও শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হবে"—রানি রাসমণি রোডে ১২ই জুলাই কমিটির ৫৯তম প্রতিষ্ঠা দিবসে কেন্দ্রীয় সমাবেশের মঞ্চে এই আহ্বানই উঠে এলো উপস্থিত নেতৃত্বের বক্তব্যে।

ব্লক, মহকুমা থেকে জেলা, রাজ্যজুড়ে পালন করা হলো শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের যুক্ত আন্দোলন মঞ্চ ১২ই জুলাই কমিটির ৫৯তম প্রতিষ্ঠা দিবসের কর্মসূচী। ১১ জুলাই সংগঠনের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয়ভাবে রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী এবং জেলাগুলোতে জেলাশাসকদের কাছে দাবীসনদ পেশ করা হয়। ১২ জুলাই কলকাতার রানি রাসমণি এভিনিউতে অনুষ্ঠিত হয়েছে কেন্দ্রীয় সমাবেশ।

সমাবেশে শূন্য পদে স্বচ্ছ পদ্ধতিতে যোগ্যতার ভিত্তিতে স্থায়ী নিয়োগ, অনিয়মিত কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের নিয়মিতকরণ, বকেয়া মহার্ঘভাতা ও মহার্ঘ রিলিফ প্রদান, পুরনো পেনশন ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনা, ব্যাংক, বীমা, রেল, প্রতিরক্ষাসহ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বেসরকারিকরণ ও আউটসোর্সিং বন্ধ সহ ১১ দফা দাবী উত্থাপন করে প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক সুমিত ভট্টাচার্য। সুমিত ভট্টাচার্য তাঁর বক্তব্যে বলেন ষাটের দশক ছিল এরাজ্যের গণ আন্দোলনের ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য সময়। সেসময় কর্মচারীদের আন্দোলন দুর্বার আন্দোলন, শিক্ষক আন্দোলন দুর্বার আন্দোলন, রাজভবনের সামনে প্রথম শিক্ষকদের গণ অবস্থান। সে সময়ের রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলন, কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী আন্দোলন এবং শিক্ষক আন্দোলনের তৎকালীন নেতৃত্ব মনে করেছিলেন যে প্রত্যেকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে আন্দোলন, সংগ্রাম করলে পরেও শাসকের কাছ থেকে যদি অধিকার ছিনিয়ে আনতে হয় এবং সেই অর্জিত অধিকার রক্ষা করতে হয়, সুরক্ষিত রাখতে হয় তবে সমস্ত শক্তিকে একটা মঞ্চে সমবেত করতে হবে। সমস্ত সংগঠনগুলোর শক্তিকে একত্রিত করে আর শক্তিশালী হয়ে শাসকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। এই উপলব্ধি থেকেই ১২ই জুলাই কমিটি আত্মপ্রকাশ করেছে। পরবর্তীকালে এই যৌথ আন্দোলন, সংগ্রামের মঞ্চ একটি সাংগঠনিক কাঠামো নিয়ে একেবারে ব্লকস্তর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। ত্রিশটিরও বেশী সংগঠন নিয়ে গঠিত এই যৌথ আন্দোলন সংগ্রামের মঞ্চ দেশের গণ আন্দোলনের ইতিহাসে এক বিশেষ অনন্য বৈশিষ্টের দাবী রাখে। ১২ই জুলাই কমিটি গড়ে ওঠার সময়েও ছিল প্রতিকূল পরিস্থিতি, আজ ৫৯ বছর পরেও রয়েছে প্রতিকূল পরিস্থিতি। তবে এই দুই প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে কিছু মিল যেমন রয়েছে, বেশকিছু অমিলও রয়েছে। রাষ্ট্র পরিচালনার নীতির ক্ষেত্রে একটা বড়ো পরিবর্তন ঘটে গেছে। ষাটের দশকে যখন ১২ই জুলাই কমিটি প্রতিষ্ঠা হচ্ছে তখন আমাদের দেশটা ছিল একটা জনকল্যানকামী রাষ্ট্র। শ্রমিক, কৃষক, কর্মচারী কিংবা শিক্ষকদের অধিকারের প্রশ্নে রাষ্ট্র সব পূরণ না করলেও অন্তত সোচ্চারে দায় অস্বীকার করতো না। কিন্তু গত তিনদশক ধরে নয়া উদারবাদী অর্থনীতির প্রভাবে আজ সরকার পেনশন ব্যবস্থাকেও শেয়ার বাজারে নিয়ে গেছে। আজকের রাষ্ট্রব্যবস্থা হলো কর্পোরেটদের ব্যবসার সাথী। এই কঠিন লড়াই আজ লড়তে হচ্ছে ১২ই জুলাই কমিটির নেতৃত্বে। ১২ই জুলাই কমিটির অপর যুগ্ম আহ্বায়ক মনোজ সাউ তাঁর বক্তব্যে রাজ্যপাল এবং নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সংগঠনের তরফে দাবীসনদ পেশ করার ক্ষেত্রে প্রশাসনের তরফে অসহযোগিতা এবং বাধাপ্রদানের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত করেন।

সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী বলেন যে সংগঠন চলে বৈজ্ঞানিক ভাবনা নিয়ে। সেই বৈজ্ঞানিক ভাবনা থেকেই যেকোনো কিছুর পরিবর্তনের পক্ষে সংগঠন। কিন্তু সেই পরিবর্তন হতে হবে ইতিবাচক। পরিবর্তন যদি ইতিবাচক না হয়, তবে তাঁর বিরুদ্ধে রাজপথে নেমে লড়াই, সংগ্রাম, আন্দোলন করতে পিছপা হয়না এরাজ্যের কর্মচারী এবং শিক্ষকরা। সরকারী দপ্তরগুলিতে কর্মচারীর সংখ্যা প্রতিদিন কমছে। স্থায়ী নিয়োগ হচ্ছে না। কাজের নিশ্চয়তা এবং সামাজিক সুরক্ষা না দিয়ে অস্থায়ী ও চুক্তিতে নিয়োগ করা হচ্ছে। শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষকদের প্রতি কেন্দ্রের এবং রাজ্যের, উভয় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী একই। তাই ১২ই জুলাই কমিটির মঞ্চকে আরও শক্তিশালী করে এই দুই শক্তির বিরুধে আন্দোলন সংগ্রাম করে যেতে হবে। এই সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সিআইটিইউ পশ্চিমবঙ্গ কমিটির সম্পাদক অনাদি সাহু বর্তমান সময়ে যৌথ আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতা সকলের সামনে তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে কেন্দ্রের বর্তমান বিজেপি পরিচালিত সরকারের শক্তি কমলেও শ্রমিক, কর্মচারীদের স্বার্থের পরিপন্থী নীতিগুলো পরিবর্তন করেনি। যেকোনো সময় শ্রম আইন চালু করে শ্রমিক, কর্মচারীদের ওপর আক্রমন নামিয়ে আনা হতে পারে। অপরদিকে রাজ্যের সরকার হকার উচ্ছেদের নামে বুলডোজার ব্যবহার এবং সালিশিসভার নামে সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার নামিয়ে আনছে। এই অবস্থাকে প্রতিহত করতে যৌথ আন্দোলন প্রয়োজন। স্মার্ট মিটার ব্যবহারের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের দুর্দশা আরও বৃদ্ধি করা হচ্ছে। একক লড়াইয়ে দাবী আদায় হয়না। যৌথ আন্দোলনের মধ্য দিয়েই কৃষক, শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক, শ্রমজীবী মানুষের দাবী আদায় জোরদার হয়।

১২ই জুলাই কমিটির প্রতিষ্ঠা দিবসের কর্মসূচী, শহীদ মিনার

এদিনের সভায় এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ব্যাংক কর্মচারী আন্দোলনের নেতৃত্ব জয়দেব দাশগুপ্ত, জীবন বীমা কর্মচারী আন্দোলনের নেতৃত্ব অমিতেশ সরকার, এবিপিটিএ'র পক্ষে মোহনদাস পণ্ডিত, বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী আন্দোলনের নেতৃত্ব অঞ্জন বোস। সমাবেশ মঞ্চে প্যালেস্টাইনের ওপর ইজরায়েলের বর্বরোচিত আক্রমণের নিন্দা করে এবং প্যালেস্টাইনের প্রতি সংহতি জানিয়ে প্রস্তাব পেশ করেন সন্দীপ রায়। এদিনের সভা পরিচালনা করেন সৌগত চক্রবর্তী, উজ্জ্বল চক্রবর্তী, তপন মিত্র এবং কল্যাণ সরকারকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমন্ডলী। সমাবেশের শুরুতে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক টীমের পক্ষ থেকে গণসঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। □

দীপঙ্কর বাগচী

৭৮তম স্বাধীনতাদিবসে কেন্দ্রীয় কর্মসূচী

জাতীয় পতাকা উত্তোলন করছেন রবীন্দ্রনাথ সিংহ রায়

১৫ আগস্ট ২০২৪ কর্মচারী ভবনে কেন্দ্রীয়ভাবে ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। শুরুতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন সংগঠনের অন্যতম সহসভাপতি রবীন্দ্রনাথ সিংহ রায়। এরপর সংক্ষিপ্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন রবীন্দ্রনাথ সিংহ রায়। বর্তমান সময়ে স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী। এরপর কর্মচারী ও পরিবার পরিজনবৃন্দের অংশগ্রহণে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপস্থাপিত হয়। তারপর বিশিষ্ট গায়ক, প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নেতৃত্ব শুভপ্রসাদ নন্দী মজুমদার সঙ্গীত পরিবেশন করেন। তার সঙ্গীত পরিবেশন এবং মধ্যে মধ্যে বর্তমান পরিস্থিতির প্রসঙ্গে বক্তব্য উপস্থিত দর্শক-শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। □

শিল্পী শুভপ্রসাদ নন্দী মজুমদার

সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
সহযোগী সম্পাদক ঃ সুমন কান্তি নাগ
যোগাযোগ ঃ দূরভাষ-২২৬৪-৯৫৯৩, ২২৬৫-০৯২৬ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২১৭-৫৫৮৮
ই-মেল ঃ sangramihatiar@gmail.com
ওয়েবসাইট ঃ www.statecoord.org
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪ থেকে প্রকাশিত এবং সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭২ হইতে মুদ্রিত।